(দ্বিতীয় সংস্করণ।)

শ্রীযশোদালাল তালুকদার প্রণীত।

প্রকাশক,

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী।

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিন্টার,

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

আই, প্রেস; শোভাবাজার, কলিকাতা।

নিবেদন।

ক্ষুদ্র হৃদয়, শক্তি সামান্য। কাজেই, সাধনা অসম্ভব। ঃ
প্রবল অভিলাষ, উপন্যাসের উন্নতি কল্পে। এ বিষয়ে কতদূর কৃতক
হইয়াছি, তাহা "ইন্দুমতীর" আদরেই বুঝা যাইবে।

আমার একটি আনন্দের কথা এই, যে আমার সাহিত্য-গুরু মান
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার (নবজীবন ও সাধারণী সম্পাদক) মহাশ
নিকট, আশার অতিরিক্ত সাহায্য পাইয়াছি। তন্নিমিত্ত চিরকৃতজ্
পাশে আবদ্ধ রহিলাম। ইত্যলং।

কলিকাতা,
১০নং বিশ্বম্ভর মল্লিক লেন।
১৬ই ভাদ্র ১৩০১ সাল।

শ্রীযশোদালাল তালুকদার

দ্বিতীয়বারের নিবেদন।

বহুকাল পরে, ভগবানের কৃপায় দৈবদুর্ব্বিপাকের হাত এড়া
এ গ্রন্থ পুন প্রচার করিলাম। ইহার কিছু পরিত্যক্ত হইয়া
কিছু কিছু স্থান বিশেষে সমাবিষ্ট হইয়াছে, আর আধুনিক ঃ
অনুসারে, ছয়খানি হাফ্-টোন চিত্রেও সুশোভিত করা হইয়া
এখন কাগজ মহার্ঘ, এ জন্য ইহার দামও কিছু বৃদ্ধি ক
গেল।

কলিকাতা।
১৬ই অগ্রহায়ণ,
১৩২৩ সাল।

গ্রন্থকার।

আমার

প্রত্যক্ষদেবতা

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র তালুকদার

পিতৃদেবের

পবিত্র পাদপদ্মে,

এই গ্রন্থ

ভক্তিভাবে উৎসর্গ করিলাম।

অভিমত।

যশোদার প্রতি আমার বেশ একটু স্নেহ আছে। স্নেহে চক্ষে সকলই ভাল—সুতরাং ইন্দুমতীও ভাল লাগিয়াছে। অ ইন্দুমতীকে ভালবাসি তাহার কবিত্বময়ী বেশভূষা ও লালিত্যম ভঙ্গির জন্য। তবে যশোদার বয়োবৃদ্ধির সহিত জ্ঞান গুণপনার বৃদ্ধি হইলে, যে তাহার উপন্যাস আরও ভাল হইবে তাহা অবশ্য না বলিলেও চলে। কালে যে সেইরূপই হইব এমন আশাও করি ও আশীর্ব্বাদও করি।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

—*—

আপনার পুস্তকখানি পড়িয়াছি। পুস্তকখানিতে বর্ণনাগু অধিকাংশ স্থলেই অতি সুন্দর ও নূতন রকমের হইয়াছে। বিশেষ বিখ্যা উপন্যাস লেখক দুই একজন ভিন্ন এরূপ বর্ণনা—কই—অন্য কাহ উপন্যাসেই ত দেখিতে পাই না। আপনার দুই একটী বর্ণনা পড়িলে বে হয় যে, সেরূপ বর্ণনা বাঙ্গলার কোনপ্রকার উপন্যাসেই নাই। এ জন্য আপনার উপন্যাসখানিকে বিশেষ প্রশংসা করি।

৫ই মাঘ ১৩০১
শুক্রবার

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী।

সমালোচনা।

ইন্দুমতী—সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত যশোদালাল তালুকদার প্রণীত। ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মুদ্রিত হইয়াছে "শিয়ালদহ" প্রেসে। ছাপা বড় ভাল হইয়াছে, বাঁধা আরও ভাল হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা। ইন্দুমতী পড়িয়া নবীন পাঠক পাঠিকারা তুষ্ট হইবেন। পরিণয়ের পূর্ব্বে প্রণয় না হইলে, কাব্য নাটক নবন্যাস কিছুই হয় না। অগ্রে চাই প্রণয় তারপর পরিণয় না হইলেও ততটা ক্ষতি নাই, প্রণয় কিন্তু চাই। এই জন্য স্বকীয় সুবিধা না হইলে, কোন কোন লোককে অগত্যা পরকীয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। "নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ।" দেখনা কেন কালিদাস স্বর্গের বেশ্যা উর্ব্বশীকেও রাজা পুরুরবার নায়িকা করিয়া দিয়াছেন। মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনা বাজারের বেশ্যা হইয়াও চারুদত্তের নায়িকা হইয়াছে। পরিণয়ের পূর্ব্বে প্রণয় অনেক কাব্য নাটকেই দেখিতে পাইবে। পাশ্চাত্য কাব্য নাটকে ত কথাই নাই, সংস্কৃত কাব্য নাটকেও অভাব নাই। কালীদাস কাব্যে কিছুই করিতে পারে নাই, কিন্তু নাটকে তুলি ধরিয়াছেন। শকুন্তলার পরিণয়ের পূর্ব্বে প্রণয়। মালবিকারও তাই। উর্ব্বশী বেশ্যা, তাহার পরিণয় কি? ভবভূতি উত্তর বীরে কিছুই করিতে পারেন নাই। কিন্তু মালতী মাধবে আশা মিটাইয়াছেন। শ্রীহর্ষ নৈষধে দময়ন্তীকে অগ্রে প্রণয়ে ফেলিয়া পরে পরিণয়ে তুলিয়াছেন। রত্নাবলী—সাগরিকা শ্রীবৎসরাজের অগ্রে প্রণয়িনী হইয়া পরে পত্নী হইয়াছিলেন। বাণভট্টের কাদম্বরী কি?

মহাশ্বেতা কি? সকলেরই ত অগ্রে প্রণয় পরে পরিণয়। সেদিনের
কথা ভারতচন্দ্র কি করিয়াছেন? বিদ্যার সঙ্গে অগ্রে প্রণয় করাই
পরে পরিণয় করাইয়াছেন। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতিকে পরকীয়া
আশ্রয় লইতে হইয়াছে। বৈষ্ণবদিগের পরকীয়া প্রধান। যখ
পরিণয়ের অগ্রে প্রণয় না হইলে কাব্য হয় না, নাটক হয় না নবন্যাসও হ
না, তখন যশোদালালকে দোষ দিব কেন? যশোদালালও ত যে সে যুবতীকে
অবিবাহিত রাখেন নাই। হঠাৎ মহামারিতে পিতা মাতা আত্মীয় স্বজ
মরিয়া যাইবার পর দুইটী বালিকাকে অগত্যা যৌবনেও আইবড় থাকিতে
হইয়াছিল। যশোদালাল দুইটী যুবকের সঙ্গে তাহাদিগের পরিণয়ের পূর্বে
প্রণয় ঘটাইয়াছেন। পরিণয়ের পূর্ব্বে প্রণয় ঘটাইতে হইলে, স্থান কা
পাত্র যেরূপ আবশ্যক, যশোদালাল সেইরূপ করিয়াছেন। অর্থাৎ সেইরূপ
প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। "সামাজিক উপন্যাস" বলাটা দোষ হইয়াছে
কেননা সমাজে যাহা ঘটে, তাহাই সামাজিক। যশোদালালের গল্প জমিয়াছে
বেশ। পরিণয়ের পূর্ব্বে প্রণয় হইয়াছে; পরিণয়ের পর প্রণয় গা
হইতে না হইতে বিচ্ছেদ হইয়াছে। যেখানে প্রণয় সেইখানেই খটকা
খটকাও লাগিয়াছে, প্রণয়িনীর উপর প্রণয়ীর—বিবাহের পর—সন্দেহ
জন্মিয়াছে। প্রণয়িনী গৃহত্যাগিনী হইয়াছেন। প্রেমিকও অনুতাপে
পাগল হইয়া দেশছাড়া হইয়াছেন। মণিহারা ফণীর মত ছটফট করিয়া
বেড়াইয়াছেন। শেষে আবার মিলন হইয়াছে। ওদিকে পাপের দণ্ড
হইয়াছে। যাহারা সাধে বাদ সাধিয়াছিল, তাহাদিগের পাপোচিত
প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। এদিকে দুঃখের পর আবার সুখ। পুণ্যের পরিণাম
ফল। কিন্তু সন্ন্যাসী পতির সন্ন্যাসে বাঁধা পড়িবে বলিয়াই কি যশোদালাল
মাধুরীকে সাপ দিয়া কামড়াইয়াছেন? আমাদের মনে হয়, মাধুরীকে

াচাইয়া রাখলেও ক্ষতি হইত না। বোধ হয় বিধিলিপির মাহাত্ম্য ঘোষণা করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহাই হউক, ইন্দুমতী হইয়াছে ভাল। রচনা প্রাঞ্জল হইয়াছে, লেখকের বর্ণনাশক্তি বেশ আছে। মধ্যে কিঞ্চিৎ ত্রুটী থাকিলেও, ভাষায় গ্রন্থকারের বেশ অধিকার জন্মিয়াছে বলিয়া মনে হয়। নবীন পাঠকসমাজে ইন্দুমতীর নিশ্চয়ই আদর হইবে।

দৈনিক ও সমাচারচন্দ্রিকা ১৭ই আশ্বিন ১৩০১।

Indumati :—This is a tale of a domestic character, and dealieg mostly with village life. Among such, might be picked out the figures, dealing with the marriage of the poet (Chap. V.) and the breaking of Dawn (Chap X X V) One of the best features of the story is the style in which it is written.

The Indian Mirror.

2nd December, 1894

ইন্দুমতী—শ্রীযশোদালাল তালুকদার প্রণীত। পুস্তক খানি যত্নের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। কাগজ বেশ, ছাপা পরিষ্কার ও উত্তম, বাঁধাই বিলাতী পুস্তকের মত। গ্রন্থের কলেবরও বৃহৎ, ডিমাই ২১ ফর্ম্মায় সমাপ্ত।

ইন্দুমতী পড়িয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। বর্ণনা ললিত, নূতন ও ভাব মধুর হইয়াছে। বেশ প্রাঞ্জল, পড়িতে পড়িতে ভাবোচ্ছাসে পূর্ণ হইতে হয়। পঞ্চবিংশ পরিচ্ছদের প্রভাত বর্ণনটী বড়ই সুন্দর হইয়াছে; ওরূপ নূতন ভাবে বর্ণনা আমরা ইতিপূর্ব্বে অন্য নভেলে দেখি নাই। এরূপ বর্ণনা এ পুস্তকে বিরল নহে।

ইন্দুমতীর উপন্যাসাংশটী বেশ মধুর। মাধুরীর কথা পড়িতে পড়িতে আমরা অশ্রুসংবরণ করিতে পারি নাই। ইন্দুমতী ও শৈলের সঙ্গে মাধুরীর প্রথম সাক্ষ্যাতের কথোপকথন কি প্রাণস্পর্শী! "আজ আমরা কদিন যাবৎ ভিক্ষার্থী হইয়াছি" ইন্দুর এই কথাকয়টী কি হৃদয়ভেদী!!! এই মাধুরীর যে স্থানেই পড়া যাউক না, সেই স্থানেই মিষ্ট বোধ হয়। আর একটী স্থান আমরা পাঠক বর্গকে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি, নরেন্দ্র সন্দিগ্ধ হইয়াছে, সন্দিগ্ধ কেন দৃঢ়নিশ্চয় জন্মিয়াছে; প্রতিশ্বাসে অনল উদ্গীরণ করিতে করিতে, নরেন্দ্র আসিয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে ইন্দুমতী অপাপবিদ্ধা ইন্দুমতী স্বামীর মুখ পানে দাঁড়াইয়া, ইন্দু সেই বজ্রবিদ্যাদগর্ভ মেঘ খণ্ডের মত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া কাঁপিয়া উঠিল। উঃ এই স্থানের দৃশ্য কি গম্ভীর! কি ভয়ঙ্কর!! এই স্থানটী পড়িতে পড়িতে আমরা এক গভীর ভাবে আত্মহারা হইয়াছিলাম। এরূপ দৃশ্য এ পুস্তকে অনেক আছে। নরেন্দ্রের উন্মাদ দৃশ্যটী তত উপযোগী বলিয়া বোধ হইল না। গৌরমণির পাপের শাস্তি বেশ হইয়াছে। উপসংহারে আমরা এই একটা কথা বলিব। পুস্তক খানির পরিচ্ছেদ সাজানে একটু ক্রটী আছে বলিয়া বোধ হইল। বিংশ পরিচ্ছেদটী, নরেন্দ্রের পত্রের পরে হইলেই ভাল হইত।

রঙ্গপুর দিক-প্রকাশ, ১২ই আশ্বিন, ১৩০১ সাল।

INDUMOTI—This is the title of a neat little volume well printed and got up, by Babu Jasoda Lal Talukder. As the name indicates it is a novel in Bengalee. The writer has considerable powers of delineating characters. The book will, we beleive, prove interesting reading to those who like fiction.

Amrita Bazar Patrika, The 20 th September, 189

ইন্দুমতী—ইহা একখানি সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযশোদালাল তালুকদার প্রণীত। ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এরূপ সুন্দর বিলাতী ধরণে বাঁধা ও উৎকৃষ্ট কাগজে পরিষ্কার ছাপা বাঙ্গালা পুস্তকের ভাগ্যে অল্পই দেখা যায়। যাহার বাহির সুন্দর, তাহার ভিতরেও সৌন্দর্য্যের আশা করা যায়। সে বিষয়েও গ্রন্থকার আমাদিগকে নিরাশ করেন নাই।

যশোদাবাবুর "সাহিত্য গুরু" আমাদের সুপরিচিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার গ্রন্থ ও তদ্রচয়িতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "ইন্দুমতীকে ভালবাসি তাহার কবিত্বময়ী বেশভূষা ও লালিত্বময়ী ভঙ্গির জন্য। তবে যশোদার বয়োবৃদ্ধির সহিত জ্ঞান ও গুণপণার বৃদ্ধি হইলে যে তাহার উপন্যাস আরও ভাল হইবে তাহা অবশ্য না বলিলেও চলে।" অক্ষয় বাবুর ন্যায় লোকে এরূপ মত প্রকাশের পর আমাদের আর কথা বাহুল্য মাত্র। বাস্তবিক গ্রন্থকার তরুণ বয়স্ক হইলেও রসজ্ঞ ও লিপিপটু এবং তাঁহার এই প্রথম উদ্যম আশাপ্রদ। স্থানের স্থানের বর্ণনা আমাদের নিকট বেশ-সুন্দর বোধ হইল। গ্রন্থের নায়ক নরেন্দ্রনাথ—বড়লোকের পুত্র। বড় লোকের কিসের অভাব হইতে পারে তৎসম্বন্ধে তিনি বলিতে-ছিলেন। 'বড় মানুষের বুঝি অভাব হইতে পারে না? মনে কর, যার হৃদয়ে নিয়ত অসুখ সে সুখের দরিদ্র; যার অন্তরে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, দয়া ও ভালবাসা প্রভৃতি কিছুই নাই, সে এ সবার কাঙ্গাল" ইত্যাদি ইত্যাদি। গৌরমণি পাপিতিনীর ষড়যন্ত্রে যখন ইন্দুমতীর চরিত্রে নরেন্দ্রনাথের সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন সেই ধূর্ত্তা, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সেই সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন; নরেন্দ্রনাথের হৃদয় তখন বর্ষাকালের ব্যোমাকাশের ন্যায় একবার নিবিড় ঘনঘটায় পরিপূরিত হইতেছে, আবার

ক্ষণকালের জন্য ঐ সন্দেহ দূরীভূত হইয়া একটুকু বিমল হইতেছে, কিন্তু অন্তঃকরণে ইর্ষার প্রবল প্রতাপ এবং উহা সম্পূর্ণ ভাবে বিলোড়িত। তিনি একবার ভাবিতেছেন, "ছি, আমি সেই জঘন্য দৃশ্য দেখিব? তা হবে না। ইন্দুমতী আমার অন্তরের সর্ব্বস্ব। আমার আঁধার ঘরের আলো। সুখে শান্তি, শোকে অশ্রু, প্রীতির প্রসূন; প্রেমের পঙ্কজ, আমার সোহাগের যাহা কিছু সকলই সে আমার। * * * ইহজগতে স্বর্গের সম্পত্তি; যাহার স্পর্শসুখে, শরীর বিবশ বিকল হয়, যাহার কথা প্রসঙ্গ কর্ণকূহরে সুধা ঢালিয়া দেয় * * কেমন করিবা তাহার বীভৎস দৃশ্য নিরীক্ষণ করিব? কে জানে পবিত্র অমৃতাশনে গরল ভক্ষণ জনিত ফল উপভোগ করিতে হয়? কে জানে কোকিল কণ্ঠ বিষ, ফুলে তরবারি, তুষারে কলঙ্ক, পঙ্কজে কণ্টক ইত্যাদি।"

ফলতঃ নরেন্দ্রনাথের শোকোচ্ছ্বাস অতি উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বড় লোকের বাড়ীর ভৃত্যদ্বারা যে, অনেক সময় অনর্থ সংঘটিত হইয়া থাকে তাহা "দোবেঠাকুর" ও "গৌরমণির" চরিত্র অঙ্কনে বেশ বুঝান হইয়াছে। নায়িকা ইন্দুমতী ও তাহার সখী শৈলবালার পরস্পর অকৃত্রিম স্নেহোদ্ভুত সখ্যভাব অতি মনোহর। মাধুরীর চরিত্রে লেখক যে আতিথ্য প্রবণতা দেখাইয়াছেন তাহা বাস্তবিকই সুদুর্লভ। গৌরমণির পাপের পরিণাম ফলও বেশ বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক বর্ণনেও গ্রন্থকার বিলক্ষণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। চন্দ্রোদয় হইতেছে এবং জড় জগতে 'কবির বিয়ের" উদ্যোগ চলিতেছে লেখক তাই লিখিতেছেন;—"চাঁদ সোণার রশি হাতে করিয়া সন্ধ্যার রঙ্গমঞ্চ হইতে আঁধারের যবনিকা খানি ধীরে ধীরে তুলিতেছেন, আর আমোদের লহরী—ছুটিতেছে—খেলিতেছে। রঙ্গমঞ্চে আজ আর লোক ধরে না আজ "কবিরবিয়ে" অভীনিত হইবে। স্বয়ং অর্দ্ধেন্দু আজ ঘটক

ইত্যাদি।” বস্তুত যশোদাবাবুর পুস্তকের নানা স্থান হইতেই এরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র পত্রিকায় স্থান হইবে না, নতুবা আরও অনেক উদ্ধৃত করিয়া আমরা পাঠকদিগের কৌতুহল চরিতার্থ করিতাম।

আমরা গ্রন্থকারের লিপিকুশলতার প্রশংসা না করিয়া পারি না এবং সুযোগ্য অক্ষয় বাবুর সহিত এই গ্রন্থসম্বন্ধে আমাদেরও একমত। তবে গ্রন্থকার নবীন। অতএব স্থানে স্থানে তাঁহার গ্রন্থে যে বঙ্কিমের কিছু ছায় পতিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয়, তিনি সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন নাই। আবার কোথায় ও ব্যাকরণাদি গত দুই একটু ভ্রম দেখা যায়; কিন্তু গ্রন্থকার শীঘ্রই যে একজন অতি উৎকৃষ্ট উপন্যাস লেখক হইবেন, তদ্বিষয়ে আশাকরা যায়। ফলতঃ পাঠক স্বয়ং এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া দেখিবেন। তাঁহার অর্থ ও পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে না।

বিক্রমপুর, ৫ই আশ্বিন ১৩০১ সন

ইন্দুমতী—সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযশোদালাল তালুকদার প্রণীত। ইন্দুমতী পাঠ করিয়া, আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। এই প্রথম উদ্যমেই যশোদা বাবু চরিত্র চিত্রণে যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যশোদা বাবু কালে একটী ভাল উপন্যাস লেখক হইবেন। গ্রন্থোক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে নায়ক নরেন্দ্রনাথ ও দুষ্টা গৌরমণির চিত্র বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা সরল ও সুললিত। ছাপাও বাঁধাই পরিপাটী।

অনুসন্ধান, ৫ই আশ্বিন; ১৩০১ সাল।

ইন্দুমতী—সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযশোদালাল তালুকদার প্রণীত। মূল্য ১্ টাকা। পুস্তকের ভাষা অতি প্রাঞ্জল এবং

"ইন্দুমতী, অন্য দিকে চাহিয়া, বাগানের ভিতর ফুল তুলিতেছিল।"

—৮৮ পৃষ্ঠা

ইন্দুমতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পথিমাঝে।

সন্ধ্যা কাল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। শোঁ, শোঁ, শোঁ, অনবরত পবন হাঁকিতেছে। গুড়ুম্, গুড়ুম্ মেঘ ডাকিতেছে। পথে চলিবার শক্তি নাই। চতুর্দ্দিকে যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত। নীচে বৃক্ষাবলী ভাঙ্গিতেছে—পড়িতেছে—কড়্ কড়্, মড়্ মড়্। গৃহের খড় ও চাল উড়িতেছে—পড়িতেছে। উর্দ্ধে মেঘান্তরালে থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ-বিভা, বক্রগতিতে আকাশ জুড়িয়া খেলিতেছে। দিগন্তব্যাপী ভীষণ বজ্রনিনাদে, জগত প্রকম্পিত ও স্তম্ভিত হইতেছে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শিলাও পড়িতেছে। পথে দাঁড়ায় এমন কোন আশ্রয় নাই।

এমন সময়, নরেন্দ্রনাথ পথিমাঝে। একাকী। ঝড়ের কঠোর উপদ্রব সহ্য করিতে না পারিয়া, তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল। কিন্তু, চলিতে চলিতে হঠাৎ পা পিছুলিয়া পড়িয়া গেল। গুরুতর আঘাত পাইল; তথাপি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। যেমন চলিতেছিল,

তখনি, চলিতে লাগিল। ভয়ে ভয়ে। ঝাপ্টা বাতাসে, নরেন্দ্রনাথের উড়ানী খানা উড়িয়া গিয়া শূন্যে ক্রীড়া করিতে লাগিল। উড়িতে উড়িতে একটী গাছের মাথায় যাইয়া, পাগ্ড়ীরূপে বিরাজ করিতে লাগিল। তখন সেই বৃক্ষটি, অন্যান্য বৃক্ষের নিকট আমীররূপে পরিচয় দিতে লাগিল। সহসা পৃথিবী আবার ঘন মেঘাচ্ছন্ন হইল। চলিবার পক্ষে বিষম অন্তরায় ঘটিল। মাঝে মাঝে তড়িৎ উদ্ভাসিত হইতেছিল সত্য; কিন্তু তত ঘন ঘন নহে। বিশেষত বিদ্যুৎ দীপ্তিতে চলিবারও সুবিধা নাই। তাড়িতালোক ক্ষণস্থায়ী—এই আছে, এই নাই। চোখের পলক সয় না। কাজেই তাতে আর কতক্ষণ চলা যায়? নরেন্দ্রনাথের মনে বড় ভয় হইল। আঁধার—বিষম আঁধার দেখিয়া, আর চলিতে সাহস জন্মিল না।

তখন একটী বৃক্ষের নীচে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল, অনতিদূরে একটি ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে। আলো দেখিয়া, নরেন্দ্রনাথের মনে কিছু ভরসা হইল। ভাবিল, এই ঝড় বাদলের সময়, লোকালয় ভিন্ন অপর স্থানে আলো থাকিবার সম্ভাবনা কি? ওখানে যাইতে পারিলে, বোধ হয়, আশ্রয় পাইতে পারিব। এই দুঃসময়ে কি আশ্রয় দিবে না? রক্ত মাংসের শরীর হইলে অবশ্য আশ্রয় দিবে। এই ভরসায় আলোকাভিমুখে চলিল। ক্রমে ক্রমে আলোর নিকট আসিল। দেখিল, যথার্থই একটী ক্ষুদ্র গৃহাভ্যন্তরে ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে। কপাটে আঘাত করিল; কপাট খুলিল না। উপর্য্যুপরি দুই চারি ঘা'র পর; গৃহের ভিতর হইতে বলিল,

"কে, গো?"

নরেন্দ্র। আমি পথিক, বড় বিপন্ন; এখানে আশ্রয় পাইতে পারি কি?

পুনরায় ঘরের ভিতর হইতে উত্তর হইল,

"আসুন।"

বলিতে বলিতে কপাটের অর্গল খুলিয়া দিল। কপাট খুলিবামাত্র প্রবল বাতাসে প্রদীপটি নিবিয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ, গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিল। এবং তড়িৎ প্রভায় দেখিতে লাগিল। দেখিল, গৃহটি দুইটি খণ্ডে বিভক্ত। নরেন্দ্রনাথ যে খণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই খণ্ডের মেঝেটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গৃহ সামগ্রী বড় বেশী কিছু দেখিতে পাইল না। কেবল দেখিল, এক পাশে একটী ভগ্ন পালঙ্ক পালঙ্কোপরি চাল ডাল রাখিবার উপযোগী কতকগুলি হাঁড়ি কুঁড়ি; এবং খাওয়া দাওয়ার উপযুক্ত দুই চারি খানি তৈজসপত্র।

তখন একটী বৃদ্ধ নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিল,

"আপনার নাম কি?"

নরেন্দ্র। নরেন্দ্রনাথ রায়।

বৃদ্ধ, নামটি শুনিবামাত্র একটু শিহরিয়া উঠিল। এবং বিনীত ভাবে নরেন্দ্রনাথকে নমস্কার করিল। নমস্কার করিয়া, নিজে যে মাদুরে শয়ন করিয়াছিল; তাহা উঠাইয়া আনিয়া বসিতে দিল। পরে, আলো জ্বালিবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু, আলো জ্বালিতে পারিল না। গৃহে আগুণ ছিল না। নরেন্দ্রনাথ, বসিয়া বলিল,

"এ বাড়ী কা'র?"

বৃদ্ধ, নীরব। এ প্রশ্নে বৃদ্ধের হৃদয়ের নির্ব্বাপিত বহ্নি যেন পুনরায়

খর ভাবে জ্বলিয়া উঠিল—কিন্তু নীরব। নরেন্দ্রনাথ সেটি বুঝিল না;
লল,

"নীরব রৈলে যে?"

বৃদ্ধ তখন বড়ই বিষাদের সহিত বলিতে আরম্ভ করিল। বলিল,

"আপনি এ গ্রামের জমিদারের পুত্র। আপনার নিকট কিছু
াপন করিব না। এ বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষ কেহ নেই।"

বৃদ্ধ নরেন্দ্রনাথকে চিনিত।

নরেন্দ্রনাথ, বৃদ্ধের মুখে আপনার পরিচয় শুনিয়া, কিছু আশ্চর্য্যান্বিত
ইল। বলিল,

"তবে তুমি কে?"

বৃদ্ধ, ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল,

"আমি এ বাড়ীর ভৃত্য।"

এখন বৃদ্ধটির অন্য পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। অন্যান্য পরিচয়, আবশ্যক
ত বলিব। কেবল নামটী বলিলেই যথেষ্ট হইবে। নাম—রামভদ্র।

নরেন্দ্রনাথ বলিল,

"এখানে তুমি কি কর?"

রামভদ্র, সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। বলিল,

"দুটি স্ত্রীলোকের রক্ষায় নিযুক্ত আছি।"

নরেন্দ্রনাথ, অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বলিল,

"তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

রামভদ্র, বিষণ্ণভাবে কহিল,

"সে বিষাদ-কাহিনী বলিবার এখন সময় নয়।"

এই বলিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

তখন নরেন্দ্রনাথের মনে প্রকৃত ঘটনাটি জানিবার নিমিত্ত নিতা
কৌতূহল জন্মিল। আগ্রহের সহিত বলিল,

"যদি বলিলে কোন ক্ষতি না হয়, তবে, বলিতে পার।"

নরেন্দ্রনাথের বিশ্বাস, ইহারা অত্যন্ত গরীব লোক। এবং খুব অভা
নিপতিত। বোধ হয় ভালরূপ খাইবার পরিবার জুটিয়া উঠে না
এটি বিবেচনা করিয়া, মনে মনে ভাবিল, যতদূর পারি, এদের অভাব মোচ
করিতে যত্ন করিব। এবং পারি যদি, ভদ্র সমাজে নিয়া, না হ
বাসস্থান করিয়া দিব।

রামভদ্রও নরেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া, ঘটনাটি বলিতে ইচ্ছুক হইয়া
আবার কি ভাবিয়া বলিল না। কেবল এইমাত্র বলিল যে, অদ্য
বিষয়ে ক্ষমা করিবেন। অনুগ্রহ করিয়া, আর একদিন আসিবেন
পরিচয় দিতে হইলে সেই দিনই দিব।

নরেন্দ্রনাথ দেখিল, রামভদ্র, আজ কোন প্রকারেই বলিতে ইচ্ছু
নহে। তখন অগত্যা আর একদিন আসিবে বলিয়া মনে মনে ঠি
করিল। এবং উঠিয়া চলিল।

রামভদ্র, নরেন্দ্রনাথকে উঠিতে দেখিয়া, নিরতিশয় নিরীহ ভা
বলিল,

"আর একদিন আসিবেন ত?"

নরেন্দ্র। আসিব।

রাম। গরিবের কথা ভুলিবেন না ত?

নরেন্দ্র। না। নিশ্চয়ই আসিব।

কথায় কথায় অনেক সময় কাটিয়া গেল।

তখন বৃষ্টি ও ঝড় থামিয়া গিয়াছে। আকাশ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; দ উঠিতেছে—ধীরে ধীরে। তারা ফুটিতেছে, একে একে। নরেন্দ্রনাথ রিষ্কার রজনী দেখিয়া, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

——:০:——

জিজ্ঞাসা।

প্রভাতে শৈলবালা আসিয়া, রামভদ্রকে জিজ্ঞাসা করিল,

"রামভদ্র, কাল রা'তে কে এসেছিলেন ?"

রামভদ্র, শৈলবালার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। এবং আত্মভা গোপন করিয়া কহিল,

"কৈ, না ? কেহ ত আসে নাই।"

শৈলবালা, গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল,

"ছি! তোমার তিনকাল গেছে; এক কাল আছে। আজ বাদে কাল মরিবে; এখনও মিথ্যা কথা ছাড়িতে পারিলে না ? ধিক্, তোমার জীবনে!"

শৈলবালা, বিগত রজনীর সমস্ত ঘটনাই জানিত—কিছু অস্পষ্ট

রামভদ্র, শৈলবালার এ কথায় যেন থতমত হইয়া গেল। বলিল—

"মিথ্যা বলিব কেন ?"

শৈলবালা, এবার চোখ রাঙ্গাইয়া কহিল,

"আবারও সেই কথা ?—"

রামভদ্রের বয়স ষাট্ কি সত্তর হইবেক। এখনও বেশ সবল ও তেজস্বী শরীরের অবয়ব দেখিয়া, কেহই বয়সের অনুমান করিতে পারে না। এখনও হাঁটিয়া পাঁচ ছয় ক্রোশের পথ যাইতে পারে। এত যে বয়স হইয়াছে

তথাপি হাঁটিবার সময়, কোথাও বসিয়া বিশ্রাম করে না। রামভদ্রের প্রাণের প্রতি বড় মমতা। পথে বসিলে, যদি কেহ মাথায় লাঠি মারিয়া, সঙ্গের জিনিষপত্র লইয়া যায়; সেই ভয়েও কোথায় বসে না। রাত্রিতে রামভদ্র, গৃহের বারেন্দায় শয়ন করিয়া থাকে। আর কত কি স্বপ্ন দেখে। কখনও স্বপ্ন দেখে, শৈলবালা যেন তাকে জোড় পা করিয়া, ভাত দিতেছে —ডাল দিতেছে—মাছের ঝোল সহ মাছ দিতেছে। আবার কখনও স্বপ্ন দেখে, শৈলবালা যেন তার পাশে বসিয়া, কত কৌতুক, কত পরিহাস, কত হাসি তামাসা ও কত গালগল্প করিতেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে রামভদ্রও যেন হাসিতেছে। হাসিতে হাসিতে যেন তার পেটের নাড়ীভূড়ী ছিঁড়িয়া যাইতেছে। শৈলবালা রামভদ্রকে ভাত দেয়; কাছে বসিয়া দু-দশটা হাসি তামাসার কথা বলে; আর মাঝে মাঝে এক আধ-টুকু চিকণ হাসি হাসে। রামভদ্র, সে সমস্তই রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়া থাকে।

রামভদ্রের আর একটি দোষ বা গুণ যাহাই বলুন, সে রাত্রিতে উঠিয়া ১০।১৫ ছিলিম তামাক খাইয়া থাকে। তামাক খাইতে উঠিয়া, শৈলবালাকে জিজ্ঞাসা করে, যে তার ঘুম হইয়াছে কি না? রাত্রি বেশী নাই; প্রভাতের তারা উঠিয়াছে; ইন্দুরে তার তামাকের পাতাটি লইয়া গিয়াছে; টীকা কোথায় রাখিয়াছে, খুঁজিয়া পাইতেছে না; প্রভৃতি নানা কথা বলিয়া, আবার শয়ন করিয়া থাকে। সেই সময়, শৈলবালা জাগিয়া থাকিলে, দু-এক কথার উত্তর দিয়া, আবার ঘুমায়। আর যে দিন শৈলবালা ঘুমাইয়া থাকে; অথবা জাগ্রতাবস্থায়ও কোন উত্তর দেয় না, সেই দিন উপর্য্যুপরি কেবলি কাশিতে থাকে। এবং সে দিন তামাকের শ্রাদ্ধ কিছু বেশী পরিমাণে হয়। সেই কাশির ও হুকার জলের গুড়্ গুড়্ শব্দে,

শৈলবালা জাগিয়াও কোন উত্তর দেয় না। কেবল রামভদ্রের তামা দেখে এবং আপনা আপনি হাসিতে থাকে।

যা'ক, সে সকল কথায় আর প্রয়োজন নাই। রামভদ্র, শৈলবাল তিরস্কার-পূর্ণ কথা শুনিয়া ভাবিল, শৈলবালা তার উপর অত্যন্ত র করিয়াছে। আজ আর জোড় পা করিয়া, ভাত দিবে না; হাসিবে ন ভালরূপ কথাও বলিবে না। এ সব ভাবিয়া চিন্তিয়া অপ্রতিভ হই রহিল।

শৈলবালা পুনরায় কহিল,

"রামভদ্র, বল, কে এসেছিলেন ?"

এই বলিয়া, ঈষৎ হাসিল।

রামভদ্র, শৈলবালার হাসি দেখিয়া, গলিয়া গেল। মনে মনে ভাবিল মান থাকিতে বলাই ভাল। বলিল,

"কাহাকেও ত বলিবে না ? তোমাদের পেটে ত কথা প'চে না।"

শৈলবালা, বিরক্ত ভাবে বলিল,

"তুমি আমায় কচীখুকী মনে করেছ নাকি ?"

রামভদ্র, মনে মনে বলিল, তুমি কচীখুকী হ'তেও বেশী প্রকাশ্যে বলিল,

"জমিদার পুত্র।"

শৈল। কোথাকার জমিদার পুত্র ?

রামভদ্র। এ গ্রামের।

শৈল। কেন এসেছিলেন ?

রামভদ্র। রাত্রিতে ভয়ানক ঝড় গিয়াছে ত জান ?

শৈল। জানি। তার কি?

রামভদ্র। সেই ঝড়ে কোন আশ্রয় না পাইয়া এখানে এসেছিলেন।

শৈলবালা। ভাল, আর একদিন আসিতে বলিলে কেন?

রামভদ্র যে, নরেন্দ্রনাথকে আর একদিন আসিতে বলিয়াছিল, শৈলবালা, গৃহের অপর খণ্ড হইতে, সেই কথাটি স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিল। রামভদ্র কিন্তু সেটি টের পায় নাই, কাজেই শৈলবালার কথা শুনিয়া, মনে মনে ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, শৈলবালার কাণে সব কথা গেল কি প্রকারে? কিছু বলিয়া সারিবার উপায় নাই। সকল কথাগুলিই না জানি কি করিয়া শুনিয়া ফেলে। শৈল, বড় দুষ্ট। আজ হইতে বাড়ীতে আর কোন কথা বলা হইবে না। এই ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিল।

শৈলবালা, রামভদ্রকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, বলিল,

"বল, আসিতে বলেছ কেন?"

রামভদ্র ভাবিয়াছিল, প্রাণান্তেও একথা কাহার নিকট প্রকাশ করিবে না। কিন্তু, শৈলবালার যন্ত্রণায় আর প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল,

"প্রয়োজন আছে।"

শৈলবালা আবার প্রশ্ন করিল,

"কি প্রয়োজন?"

রামভদ্র এবার একটু রাগত ভাবে বলিল,

"সব কথাই তোমাকে বলিতে হইবে নাকি?"

শৈলবালাও রাগিয়া বলিল,

"বলিবে বৈ কি? একশ বার বলিবে।"

রামভদ্র। যাও; আমি বলিব না।

শৈলবালা, মুখভঙ্গি করিয়া কহিল,

"যাচ্ছি গো, যাচ্ছি! দেখি, আজ তুমি কি খাও।"

শৈলবালা চলিয়া যাইবার ভাণ করিল।

রামভদ্র, চড়ে চড় খাইল। অনুপায় ভাবিয়া, তাড়াতাড়ি শৈলবালার হাত ধরিল। কিন্তু, শৈলবালা হাত ঝাড়া দিয়া কহিল,

"হাত ছাড়! আমি তোমার কথা শুনিব না।"

রামভদ্র অত্যন্ত কাতরতার সহিত বলিতে আরম্ভ করিল,

"ছি, শৈল! রাগ কর কেন? তোমার নিকট না বলিলে, আর কা'র নিকট বলিব? তোমার সহিত একটু গল্প করিলাম বৈত নয়!"

শৈলবালা বুঝিল, রামভদ্র ভয় পাইয়াছে। এখন সকল কথাই বাহির হইবে। বুঝিয়া শান্ত হইল। বলিল,

"ভাল; এখন বল।"

তখন রামভদ্র, শৈলবালার নিকট চুপি চুপি কত কি বলিল। শৈলবালা, শুনিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। রামভদ্রও ডাবা হুক নিয়া তামাক ধ্বংস করিতে বসিল।

উপর্য্যুপরি তামাক খাওয়া, রামভদ্রের একটী মহৎ দোষ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

পুনরাগমন।

নরেন্দ্রনাথ, কখনও প্রতিশ্রুত বিষয়ের অন্যথাচরণ করে না। রামভদ্রের কথানুযায়ী, পুনরায় সেই ভবনে উপনীত হইল। রামভদ্র, নরেন্দ্রকে দেখিয়া পরমানন্দিত হইল। এবং সসম্ভ্রমে কহিল,

"এসেছেন? ভালই হইয়াছে। দরিদ্রের কথা যে স্মরণ আছে, এই যথেষ্ট।"

নরেন্দ্রনাথ, ঈষৎ হাসিয়া কহিল,

"জগতে সকলেই দরিদ্র।"

মোটাবুদ্ধিসম্পন্ন রামভদ্র, নরেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া জিভ্ কাটিল। বলিল,

"ছি! তা-কি বলিতে আছে। আপনারা হ'লেন বড় লোক।"

নরেন্দ্র। তুমি আমার কথা বুঝিতে পার নাই। জগতে যার যে বিষয়ে অভাব, সে সেই বিষয়ের দরিদ্র। বড় মানুষেরও দরিদ্রতা আছে।"

রামভদ্র, এবারও নরেন্দ্রনাথের কথা ভাল বুঝিতে পারিল না। বলিল,

"সে কি? বড় মানুষের আবার অভাব কি?"

নরেন্দ্রনাথ হাসিল। কহিল,

"বড় মানুষের বুঝি অভাব থাকিতে পারে না? মনে কর, যার অর্থ নাই, সে অর্থের দরিদ্র; যার হৃদয়ে নিয়ত অসুখ, সে সুখের দরিদ্র; আর যার অন্তরে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, দয়া ও ভালবাসা প্রভৃতি কিছুই নাই, সে এ সবার কাঙ্গাল। বড় মানুষের কি সবই থাকে? এখন বুঝিলে জগত দরিদ্রতাময় কেন?"

রামভদ্রের মনে তখন আশা জাগিল। কহিল,

"আপনি কিসের কাঙ্গাল?"

নরেন্দ্রনাথ, নীরব।

রামভদ্র, কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়াই ভাবিতেছিল, সে কি প্রকারে ইন্দুমতীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবে। তার মোটা বুদ্ধিতে সেটি যোগাইতে পারিতেছিল না। কাজেই রামভদ্রের মন ঐ বিষয়েই তন্ময় ছিল। নরেন্দ্রনাথ, কথার উত্তর দিল কি না দিল—তৎপ্রতি লক্ষ্যও ছিল না। কিয়ৎকাল পর, একটী অসংলগ্ন প্রশ্ন করিল,

"আপনার বড় কষ্ট হয়েছে।"

নরেন্দ্রনাথের মুখে ঈষৎ হাসির ছায়া পড়িল। কহিল,

"কেন?"

রামভদ্র এ হাসিতে অপ্রস্তুত হইল কিন্তু বলিল,

"এতদূর পরিশ্রম ক'রে এসেছেন।"

নরেন্দ্র। তার জন্য কি? এ তো সামান্য পরিশ্রম। আসিতে বলেছিলে কেন?

এ কথা শুনিয়া, রামভদ্র হাতে যেন আকাশ পাইল। ইন্দুমতীর প্রসঙ্গ উঠাইতে আর কোন প্রকার ঠেকিল না। বলিল,

"সে সব কথা এখানে বলিতে পারিব না। চলুন, একটু নির্জ্জনে যাই।"

শৈলবালার ভয়ে বুঝি?

নরেন্দ্রনাথ। চল।

বাড়ীর সদর রাস্তার অগ্রভাগে, একটী বকুল গাছ ছিল। উভয়ে সেই বকুল তলায় আসিয়া বসিল। বকুল গাছটীর শাখা প্রশাখা গুলি অতি সুন্দরভাবে চতুর্দ্দিকে প্রসারিত। ডালে ডালে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ভ্রমরকুল, আকুল প্রাণে, মধু লোভে প্রমত্ত হইয়া সুর তুলিয়া উড়িতেছে—বসিতেছে; বসিয়া বসিয়া আবার উড়িতেছে। পরিপক্ক বকুল খাইবার নিমিত্ত দুটি কোকিল, এডালে ওডালে ঘুরিতেছিল। এবং কুহু কুহু করিয়া ডাকিতেছিল। রামভদ্র কিন্তু কোকিলের এ মধুর ডাকেও বিরক্ত হইতেছিল। কারণ, বকুল তলায় আসিয়া, ইন্দুমতী ঘটিত কথা, কিভাবে উল্লেখ করিবে তাহা ঠিক করিতে পারিতেছিল না। জিহ্বা যেন আড়ষ্ট হইয়া আসিতে ছিল। সহসা নরেন্দ্রনাথের হাতে ধরিল। বলিল,

"মহারাজ, আমার একটী কথা রাখিবেন?"

নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইল। কহিল,

"কথাটি কি?"

রামভদ্রের শরীর কাঁপিতেছিল। বলিল,

"যে কথাই হউক, রাখিবেন ত? কোন মন্দ কথা নহে।"

নরেন্দ্রনাথের বিস্ময় আরও বাড়িল। বলিল,

উপযুক্ত বিবেচনা করিলে রাখিব।"

রামভদ্র। বলিতে ভয় হয়।

নরেন্দ্রনাথ, ঈষৎ হাসিল। কহিল,

"ভয় কি? বল।"

তখন রামভদ্র, সাহস পাইয়া, নরেন্দ্রনাথের কাণে কাণে গুটিকতক কথা বলিল। নরেন্দ্রনাথ, কথাগুলি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিল। এবং নিতান্ত নিরীহ ভাবে বলিল,

"আমার কোন অমত নাই। বাবার মত হইলেই হয়।"

রামভদ্র। আমি সে বিষয় ঠিক করিব।

নরেন্দ্র। পার, ভালই।

এই বলিয়া, নরেন্দ্রনাথ উঠিয়া চলিল। বকুল গাছের কোকিল দুটিও মারামারি করিতে করিতে উড়িয়া গেল।

কেবল রামভদ্র সেখানে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

——:o:——

নরেন্দ্রনাথ কে ?

হাসিকান্না গ্রামের জমিদার, শম্ভুনাথ রায়। রায় মহাশয় বিপুল অর্থ, যশ ও মান সঞ্চয় করিয়াছেন। গ্রামের বাহিরেও বেশ প্রতিপত্তি আছে। দেশে বিদেশে, সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু জমিদারী আছে। জমিদারীতে বার্ষিক প্রায় দুই লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অপরাপর কাযকর্ম্মেও প্রায় দুই লক্ষ টাকা আয় হয়। যাঁহার বার্ষিক চারি লক্ষ টাকা আয়, তাঁর প্রতি লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে, বলিতে হইবেক। লক্ষ্মী রায়মহাশয়ের ভাণ্ডারে নিয়ত বিরাজমানা। জমিদার বাবুর গৃহিণী, পরমাসুন্দরী ও লক্ষ্মীস্বরূপা। পত্নীর সুব্যবহারে রায়মহাশয় বড়ই প্রীত। বড় লোকের যে প্রকার বাড়ী ঘর হইয়া থাকে রায় বাড়ীও তদ্রূপ। বরং কোন কোন অংশ বিশেষ পারিপাট্যের সহিত গঠিত। বাড়ীটি পাঁচ মহলে বিভক্ত ;—

প্রথম মহল—বাহির বাড়ী। বাহির বাড়ীতে অনেকগুলি বড় বড় কুঠি। তার এক এক কুঠিতে স্কুল ঘর, ডাক্তার খানা, রঙ্গমহল ও কর্ম্মচারীদের বাসস্থান। বাহির বাড়ীর মধ্যস্থলে, একটী প্রকাণ্ড চত্বর। চত্বরের ঠিক মাঝখানে, একটী ইষ্টক বিনির্ম্মিত বৃহৎ চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চাতে একটী প্রকাণ্ড কুম্ভীর ও একটী বড় কচ্ছপ। লোকে যে

ছুটীকে দেখিবার সময় পড়িয়া না যায়, তন্নিমিত্ত চৌবাচ্চার চারিধা
রেলিং দেওয়া। আবার চত্বরের পর সুদীর্ঘ পুকুর। পুকুরের উ
পারে ফুলের বাগান; দক্ষিণ পারে সদর রাস্তা। সদর রাস্তা
শেষ সীমানায়, হাট বাজার। তারপর খাল,—নদীর সহিত সংযুক্ত

দ্বিতীয় মহল—কাছারী বাড়ী। এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে
হইলে, একটী সিংহদ্বার পার হইতে হয়। সিংহদ্বারের উপরে
একধারে সিংহ, অন্যধারে ব্যাঘ্রমূর্ত্তি সংস্থাপিত। সিংহদ্বারের দুই
পাশের কোঠায় দ্বারবান ও পাঁড়ে ঠাকুরদের থাকিবার স্থান
কাছারী বাড়ীতে চারি খানা সুরম্য কুঠরি। তার একখানায়
রায়মহাশয় প্রজাদের বিচার করেন; একখানায় বৈঠকখানা। বৈঠক-
খানার চারিদিকে বিবিধ প্রকার সুরঞ্জিত কৌচ—গালিচা পাতা।
মধ্যস্থলে, একটী বৃহদায়তন শ্বেতপ্রস্তরবিনির্ম্মিত টেবিল। টেবিলের
চারিদিকে কয়েকখানা নূতন চেয়ার। এবং দেয়ালে সুন্দর সুন্দর
ছবি লটকান রহিয়াছে। আর একখানায় আফিস গৃহ। এখানে
জমীদারী সংক্রান্ত যাবতীয় লেখা পড়া হইয়া থাকে। চতুর্থ কুঠিতে
তেজারতি সংক্রান্ত কার্য্যকর্ম্ম হইয়া থাকে। এখানে দিবারাত্র
অত্যন্ত ভিড়। সর্ব্বদা টাকার ঝন্ ঝন্, কন্ কন্ শব্দ; হুকার
গুড় গুড় শব্দ; তামাক দে, পান দে, ইত্যাদি শব্দে, এ মহল
পরিপূর্ণ। কেহ টাকা নিয়া যাইতেছে; কেহ টাকা গণিয়া জমা
[illegible]তেছে, কেহ বা থলে হাতে করিয়া, টাকা নিতে আসিয়াছে।
জাহ্নবী মণ্ডল মহাশয়, নিঃশব্দে লেখনী চালনা করিতেছেন। বড়
খাতা, বাক্সের উপর রাখিয়া নীলমণি পেস্কারের নামে

,০০০৲ টাকা জমা করিতেছেন; গোবর্দ্ধন শব্দচূড়ামণির নামে
াটের নম্বর লিখিয়া ৩০,০০০৲ টাকা খরচ লিখিতেছেন। গুজারতের
গু" লিখিতে লিখিতে গলদ ঘর্ম্ম হইতেছেন। এবং অন্যান্য
র্ম্মচারীদের প্রতি ভ্রূকুটি করিতেছেন। চন্দ্রচূড় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়,
াণ্ডনোটে টাকা নিতে আসিয়াছেন। কর্ম্মচারীদের মধ্যে ঘোষাল
হাশয়, দে মহাশয়, "তহরির" নিমিত্ত চাটুর্য্যে মহাশয়ের সঙ্গীয়
গামস্তাকে খোসামোদ করিতেছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন,
তনি অত্যন্ত ভদ্র লোক, কিছু দিবেনই। মুখুর্য্যে মহাশয় বলিতেছেন,
আমরা এসব লোকের নিকটই দু'দশ টাকা পাইয়া থাকি। ঘোষ
মহাশয় বলিতেছেন, চাটুর্য্যে মহাশয়ের যে প্রকার প্রশস্ত অন্তঃকরণ,
তাতে আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি ইত্যাদি কৌশলবাক্যে চাটুর্য্যে
মহাশয়ের মাথা ঘুরাইয়া দিতেছেন। তিনিও কিছু না দিয়া যাইতে
পারিতেছেন না। এত খোসামোদের পরও ঘোষালমহাশয়, কর্জ্জকারীর
উড়ানী ধরিয়াই আছেন। এবং বলিতেছেন, "দেখুন আর পাঁচটি
টাকা দিলেই আমরা মহাসন্তুষ্ট হইব। আমরা সংখ্যায় এক পরিবার
তুল্য।" অর্থ পাইলে সকলেই সন্তুষ্ট।

তৃতীয় মহল—দুর্গাবাড়ী। এখানে দোল দুর্গোৎসব, বার মাসের
বার ক্রিয়া হইয়া থাকে। এ মহলের সংযুক্তই অতিথিশালা।
অতিথিশালায় অতিথিদের গান বাজনা, হাস্ পরিহাস, গাঁজার
ধুম্‌ধাম্ অষ্টপ্রহর সমভাবে চলিতেছে।

এর পরের মহল—অন্দর বাড়ী। এখানে অনেকগুলি দ্বিতল
গৃহ। তার একটীতে রায়মহাশয়, একটীতে নরেন্দ্রনাথ শয়ন করিয়া

থাকেন। আর কতকগুলি গৃহ, মূল্যবান গৃহ সামগ্রীতে পরিপূর্ণ অন্দর মহলের পর আর একটী মহল আছে। সেই মহলে আগন্তুক আত্মীয় কুটুম্ব ও দাসীরা থাকে। প্রত্যেক বাড়ীতে মেয়েদের যাতায়াতের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন সুরক্ষিত পথ আছে। যেমন প্রকাণ্ড বাড়ী; তেমনি প্রকাণ্ড প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। রায়মহাশয়, এসব যে কত টাকা ব্যয় করিয়া করিয়াছেন; তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারে না।

রায়মহাশয়, শয়নার্থ গৃহে আসিয়াছেন। দেখিলেন, গিন্নী শয়নকক্ষে নাই। কাজেই কর্ত্তার মন ভাল লাগিল না, অত্যন্ত বিরক্ত বোধ হইতে লাগিল। আবদ্ধ পাখীর ন্যায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। জমিদার বাবু তখন কপট অভিমান করিলেন। মনস্থ, গিন্নীকে জব্দ করিবেন। আর যেন কখনও গৌণে না আসেন। এই মনস্থে, পালঙ্কোপরি বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিলেন। কিছুকাল পর, গিন্নী ত কার্য্যান্তর হইতে শয়নমন্দিরে আসিলেন। আসিয়া কর্ত্তার যে ভাব অবলোকন করিলেন, তাহাতে গিন্নী, রায়মহাশয়ের কপট অভিমান অতি সহজেই বুঝিতে পারিলেন। কাজেই, কর্ত্তার হাসি ও কথা বাহির করিবার নিমিত্ত সহাস্যে বলিলেন,

"গাছের পাতাটি ন'ড়ে না; সংসারে বাতাস মাত্র নেই তবুও তুফান? একি রকম?"

কর্ত্তা, নীরব—নিশ্চল।

গিন্নী, প্রত্যুত্তর না পাইয়া নিজে নিজেই বলিতে লাগিলেন। বলিলেন,

"যে ঝড়! এখানে আর দাঁড়াতে পারিলাম না। যাই, অন্য ঘরে যাই—"

এই বলিয়া, গিন্নী, গমনোদ্যতা হইলেন। এবং দুই চারি পা হাঁটিলেনও।

কর্ত্তা তখন বিষম বিপদে পড়িলেন। গিন্নী, চলিয়া গেলে হৃদয়ে আরও অসন্তোষ জন্মিবে,—অশান্তির হিল্লোল বহিবে। তাই গিন্নীকে যাইতে দেখিয়া, অভিমান ত্যাগ করিলেন।, বলিলেন,

"আর যেয়ে কাজ নেই। আমিই না হয় হারলুম।"

কর্ত্তা আপন মান আপনি নষ্ট করিলেন। গিন্নীর চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না। কাজেই, কর্ত্তার কথা বাহির করিতে, গিন্নীকে আর কোনও ক্লেশ পাইতে হইল না।

তখন গৃহিণী আসিয়া রায়মহাশয়ের সন্মুখে বসিলেন। এবং নথ খুঁটিতে খুঁটিতে নরেন্দ্রনাথের বিবাহের কথা তুলিলেন। রায়মহাশয়ের একমাত্র পুত্র—নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রকে এখন অনেকেই চিনিয়াছেন; অন্য পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। শ্বশুর বাড়ী ভাল হওয়া চাই। নরেন্দ্র দুই চারি দিন থাকিলে, যেন কোন কষ্ট না হয়। বৌটি রূপে নধর নধর করিতে থাকিবে। গিন্নী কর্ত্তাকে নিজের ঈষৎ খাঁদা নাক দেখাইয়া বলিলেন যে, বৌর নাকও যেন ঐ প্রকারই হয়। গিন্নীর রূপ, পাকা চাঁপাকলার তুল্য। অঙ্গ সৌষ্ঠবও প্রীতিপ্রদ। দোষের মধ্যে কেবল নাসিকাটি খাঁদা ও চক্ষু দুটি ছোট। রায়মহাশয় কিন্তু এতেই বিমুগ্ধ। গিন্নীও ঐ প্রকার চক্ষুই সুন্দর বলিয়া বর্ণনা

করিলেন। কর্ত্তা, সত্যের অপলাপ বা অপমান করিলেন না। বরং রহস্যচ্ছলে কিছু বাড়াইয়া কহিলেন,

"তোমার মতন খাঁদা নাক ও কোটর চক্ষু বৌ এনে শেষে কি আমার মতন, ছেলের মন ভাঙ্গিব? তা আমি কখনও পারিব না!"

কর্ত্তার কথা শুনিয়া, গিন্নী গাল ভারী করিলেন। আবার নথ খুঁটিতে খুঁটিতে কহিলেন,

"এত ঠাট্টা কেন? আমার চোক নাক অপছন্দের নাকি? অপছন্দের হ'লে বিবাহ না করিলেই হ'ত! দেখ্‌ব, দেখব, আমার মতন কেমন বৌ পাও! তা আর পেতে হবে না। আমিও মরিব না। এখানে ব'সে ব'সে সকলি দেখ্‌ব।"

মেয়েদের যত রাগ স্বামীর নিকট। রায়মহাশয়, সহাস্যে কহিলেন,

"তুমি রাগই কর, আর যাই কর, তোমার চেয়ে সুন্দরী বৌ না পাইলে, নরেনের বিবাহও দিব না।"

গিন্নী, একটুকু অহঙ্কারের সহিত বলিলেন,

"যত দেখ ধুম্ ধাম্।
কার্য্য কালে,
যেই রাম সেই রাম॥"

কর্ত্তা, গিন্নীর শ্লোক শুনিয়া মনে মনে হাসিলেন। কহিলেন,

"তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমার চেয়ে সুন্দর নাক ও ভাসা ভাসা ডাগর চোখ দেখে বৌ আনিব।"

গিন্নীর রাগ নরম পড়িল। কহিলেন,

"বর্ণটি কেমন আনিবেন?"

কর্ত্তা। তোমার চেয়ে ভাল পাইলে আর খারাপ খুঁজিব না।

গিন্নী, নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন। কহিলেন,

"কেন? আমার বর্ণ মন্দ নাকি?"

কর্ত্তা, এবার গিন্নীর মনস্তুষ্টি সাধন করিলেন। কহিলেন,

"বর্ণ এর চেয়ে বড় ভাল পাওয়া যায় না। তবে যদি রেন্দ্রের ভাগ্যে ঘটে।"

গিন্নীও এবার কিছু আহ্লাদিত হইলেন। কহিলেন,

"দেখা যাবে কেমন বৌ আসে।"

এই বলিয়া গিন্নী খাবার যোগাড় করিতে গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।
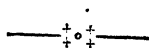
নদীজলে।

আকাশে পা টিপিয়া টিপিয়া চাঁদ উঠিতেছে। চাঁদ, সোণ রশি হাতে করিয়া, সন্ধ্যার রঙ্গমঞ্চ হইতে আঁধারের যবনিকাখা ধীরে ধীরে উঠাইতেছে—দর্শকের প্রাণে ধীরে ধীরে আমোদ লহরী ছুটিতেছে—খেলিতেছে। রঙ্গমঞ্চে আজ আর লোক ধ না—আজ "কবির বিয়ে" অভিনীত হইবে। স্বয়ং "অর্দ্ধেন্দু" অ ঘটক। গোধূলি লগ্নের (*Candle light*) আর বেশী বাকী নাই পঙ্গপালের মত দর্শকেরা আসিয়া যুটিতেছে—ভাল ভাল আসন স থাকিতে দখল করিতেছে।

বিটপী বাবুরা ফুলের তোড়া হাতে করিয়া বিশেষ আস শ্যামল মখমলের কৌচে বসিয়াছিলেন। এবার তাহারা পাতা রুমাল দিয়া মুখমণ্ডলগুলি মাজিয়া ঘষিয়া নিলেন। লতিকাসুন্দরীর হরিত-চিকের আড়ালে থাকিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিলেন দুই একটি লতিকা বড় প্রগল্‌ভা,—তাহারা চিকের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষু ছিদ্র করিয়া, সুনীল সরোবরে পদ্মফুল ফুটাইতে লাগিলেন। যবনিক ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। গ্যালারির বিহঙ্গ বেচারীদের মধ্যে

া হৈ চৈ পড়িয়া গেল। গ্যালারির মধ্যে কাকের সংখ্যাই
ক; তাই অবিরত কলকণ্ঠের কোলাহলে থিয়েটার হল্ নিনাদিত
ত লাগিল। গ্যালারিতে মাঝে মাঝে শাপভ্রষ্ট দুই চারিটী শ্যামা
য়া আশ্রয় নিয়াছিল; তাহারা নিজেদের অস্তিত্ব জানাইবার
সিসের কারদানি করিতে লাগিল। গ্যালারি গুল্‌জার হইয়া
ল।

আর সহ্য হয় না—বড় গৌণ হইয়া চলিল—"লগ্ন" উত্তীর্ণ হইয়া
নে! "ওগো বিয়ের বাজ্‌না বাজাও"—রঙ্গভূমির দর্শকগুলি ঔৎসুক্যে
ীর হইয়া উঠিল। এবার চাঁদ খুব্ একদোম্ রশ্মি টানিলেন;
ঝঁর দল অমনি একতান বাদ্য বাজাইতে লাগিল।

"চুপ্ চুপ্" এখনি অভিনয় আরম্ভ হইবে। ঐ শুভ্র জলদাসনে
ার রঙ্গমঞ্চে রোহিণী সখিগণের সমভিব্যাহারে গগন-উদ্যানে
রণ করিতেছেন। কবি চকোরের ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া এদিক্
দিক্ ছুটিতেছেন—মাঝে মাঝে কল্পনার চাবুক দিয়া অশ্বিনীকুমারকে
ার করিতেছেন—(নেপথ্যে)—"ও কবি মহাশয়, পালাও—পালাও,
দ তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন। ঐ শুন তার হাঁক্
ক্—পালাও—শীঘ্র পালাও।" কবি, চকোর-ঘোড়া তাড়াতাড়ি
বনী অভিমুখে ছুটাইলেন। জলদ, নাছোড়বান্দা; বিদ্যুতের অসি
য়া—বজ্রের গদা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া—চকোরের পাছে পাছে ছুটিলেন
-চাতকে চড়িয়া।

অভিনয় থামিয়া গেল। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, সে
জনীতে বিটপী বাবুর দল বড় নাস্তনাবুদ হইয়াছিলেন—

লতিকাসুন্দরীদের ও কথাই নাই! তাঁহারা সে দিন সারারাত স্নান মন্দিরে যাপন করিয়াছিলেন—আর গ্যালারি!—সে কথায় কাজ কি?

"কনির বিয়ে" হইল না। এই দুর্যোগে সুশিক্ষিতা অভিনেত্রী শুক-কুমারী দত্ত উপস্থিত হইতে পারেন নাই; তাই আজ অভিনয় বন্ধ থাকিল। কবি কুমার হইয়াই থাকুন্।

আকাশের মেঘ আকাশে মিশিয়া গেল। ঝড়, দুই চারি বার দন্ত কড়্ মড়্ করিয়া, প্রকাণ্ড দৈত্যের মত কোথায় চলিয়া গেল। দৈত্যের হৃদয়ে দয়া মায়া নাই; চোখে অশ্রুজল নাই; আছে কেবল, বিদ্বেষের বিদ্যুৎ-বহ্নি—শ্মশানের শ্বাস। তাই বসুমতীর প্রাণ শীতল হইল না। কেবল ধান্যের শ্যামলসাগর, ক্ষণেকের তরে সংক্ষোভিত হইয়াছিল। সোণার মুকুট হইতে চুণীমণিগুলি চতুর্দ্দিকে কে ছড়াইয়া দিল? কৃষকের সোণার রাজ্যে মহাবিপ্লব হইয়া গেল।

এই মহাদুর্য্যোগের পর, আবার মিটি মিটি করিয়া, তারা জ্বলিল। একখানা কনকের ধেনু নীল পটে কে আঁকিয়া রাখিল? ধনুতে এখনও কিরণের কোমল মধুর বাণ গুলি আরোপিত হয় নাই। তবুও কাল মেঘগুলি বাণের ভয়ে, প্রাণ হাতে লইয়া পলাইতে লাগিল।

রাত্রি দণ্ড চারি হইয়াছে। বৈশাখের রাত্রি, বড় স্নিগ্ধ, বড় মধুর। তাতে একটু ঝিকি মিকি লাগিয়াছে—একটু আলো ফুটিয়াছে; কত সুন্দর,—কত মনোহর!

ইছামতীর দুই তীর, শ্যামল তৃণে পরিপূর্ণ। লতাগুল্মে আচ্ছাদিত;

স্থানে স্থানে বেতস লতার কুঞ্জ; কোথায়ও বা দু একটী কণ্টকী বৃক্ষ; তিন্তিড়ি, খর্জ্জুর, বট ও অশ্বত্থের শাখা, ইছামতীর কাল জল চুম্বন করিবার জন্য যেন নত হইয়া পড়িয়াছে। কুশ-তৃণের শ্রেণী, সেই জলে আকণ্ঠ ডুবাইয়া, চাঁদের কিরণ পান করিতেছে। কোথাও গ্রামবাসীদের ঘাট; মাটি কাটিয়া সোপান বাঁধিয়া ঘাট করা হইয়াছে। এই ঘাটের অনতিদূরে, একখানি ক্ষুদ্র কুটীর। কুটীরের এক মালিক, শ্রীরামভদ্র। রামভদ্র, এই ঘাটে আসিয়া প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করে। রামভদ্রের কুটীরে দুইটী পালিতা শিশুর (এখন রমণী বলিলেই হয়) সহিত পাঠকের পরিচয় করাইয়া দিতেছি। শৈলবালার সহিত ইন্দুমতী, একত্রে লালিত পালিত হইয়াছে। শৈলবালা, সন্ধ্যার সময়, ইন্দুমতীকে নিয়া, প্রত্যহ ঘাটে স্নান করিতে আইসে। ঝড় তুফানের নিমিত্ত, আজ ঘাটে আসিতে কিছু বিলম্ব হইল।

এখন ঝড় তুফানের হাঙ্গামা আর নাই। শৈলবালা, ইন্দুমতীকে লইয়া, ধীরে ধীরে গান গাইতে গাইতে, নদীজলে যাইতেছে। শৈলবালা, বড় গান-ভক্ত। তাহার গানের বড় একটা অর্থ হইত না। একটা কিছু হাতে পাইলেই, গলা সাধিয়া গান ধরিত। পুষি বিড়ালকে নিয়া,নানা ছন্দে গীত রচনা করিত। কখন গাইত :—

ওরে আমার পুষি!
তোরে মাছের শিরে, দুধের সরে
আদর করে পুষি!
আজ যে একাদশী,
নিরামিষ খেলে খাবি, 'নৈলে যাবি'
যেখানে তোর খুসি।

কখনও রামভদ্রের টাক্‌পড়া মাথা স্মরণ করিয়া গাইত ;—

চর পড়েছে মাথে—ওগো,
চরের নাম যে টাক্ ;
চার ধারেতে সাদা জল
মাঝখানেতে ফাঁক্।

এদিকে নরেন্দ্রনাথ বকুল তলায় রামভদ্রের সহিত কথোপক[illegible] করিয়া উদ্ভ্রান্ত-মানসে চলিতেছিল। চলিতে চলিতে হঠাৎ তাহ[illegible] শ্রবণ বেলায় একটী সুস্বর লহরী চুম্বন করিল। নরেন্দ্রনাথ [illegible]ত যেন মদিরাবিহ্বল হইয়া পড়িল। সঙ্গীত লক্ষ্য করিয়া ছুটি[illegible] স্বর-তরঙ্গ, এবার শ্রবণ বিবরে আসিয়া আঘাত করিল। [illegible] আঘাত নয়, ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল। স্বর এবার গা[illegible] পরিণত হইল। স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর শ্রুত হইতে লাগিল। শুনিল

এসো বঁধু এসো নিকুঞ্জকাননে।
হেরিবে শ্রীরাধা ভরিয়ে নয়নে॥
তুয়া সম কোন জন, নাহি বলে ত্রিভুবন,
রাধাকান্ত তুমি শ্যাম এ বিপিনে।
রাধার ভাঙ্গা কুটীর, তাহে যমুনার তীর,
বক্ষ বিথারি তুষিবে তুয়া ধনে॥

শৈলবালা এ গানটি বৈষ্ণবীদিগের নিকট শিখিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ আরও অগ্রসর হইতে লাগিল। গান যেন মূর্ত্তি[illegible]

স্থানায় বোধ হইতে লাগিল। পরে সম্মুখে দেখিল, দুইটি সঙ্গীত-তরঙ্গ বৃন্দা বাধিয়া যেন তীরদেশে আসিয়াছে। নদীর জলে সেই সঙ্গীতের চুয়া পড়িয়াছে; চাঁদের কিরণে সঙ্গীত-তরঙ্গ দুটি উজলি উজলি হাসিতেছে। বন, উপবন, আকাশ সঙ্গীতে যেন ডুবিয়া গিয়াছে। নরেন্দ্রনাথের হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। শৈলবালা ইন্দুমতীকে বলিয়া উঠিল। বলিল,

"সই, রাত হয়েছে; চল ঘরে যাই।"

নরেন্দ্রনাথ, সবিস্ময়ে দেখিলেন, এ সঙ্গীত নয়,—দুটী রূপবতী রমণী। জলে পা ডুবাইয়া, পৃষ্ঠে আর্দ্র কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশগুচ্ছের ভার চাইয়া বসিয়া আছে। নরেন্দ্রনাথ ভাবিল, এ জলদেবী, না মানবী? মানবীর কি এরূপ দেবোপম রূপলাবণ্য হয়? ঐ পদ্মপলাশলোচন যুগল, ঐ অনিন্দ্য চাঁদপানা মুখকমল, ঐ অতসী পুষ্পবিনিন্দিত বরণ, ত যে লোকললাম; কত যে আঁখি-তৃষ্ণাবর্দ্ধক, কে তাহা নির্ণয় করিবে? নিশ্চয় এ সাগরবালা। রত্নাকর ভিন্ন রতন আর কোথায় হওয়া সম্ভব? রতন সাগরে জন্মে কেন?

নরেন্দ্রনাথ এইরূপ ভাবিতেছে; এমন সময়, শৈলবালা ও ইন্দুমতী ধীরে ধীরে জল হইতে উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। নরেন্দ্রনাথের যেন সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল এবং নিরাশার প্রকম্পনে হৃদয় দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অনিমিষ ও প্রীতিবিস্ফারিত লোচনে রমণীদ্বয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল। চলিতে চলিতে, শৈলবালা ইন্দুমতীকে বলিল,

"সই, আর বুঝি অধিক দিন এমন করিয়া স্নান করিতে পারিবে না?"

"ইন্দুমতী ও শৈলবালা জলে পা ডুবাইয়া, পৃষ্ঠে আর্দ্র কবরী,
কখনও কেশগুচ্ছের ভার ছড়াইয়া বসিয়া আছে।" ২৮ পৃষ্ঠা

ইন্দু। কেন, সই?

শৈল। জলেতে কুমীর এসেছে!

ইন্দু। এ আবার কোন রঙ্, সই!

শৈলবালা, অনতিদূরে নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়াছিল। সেই কথ ইন্দুমতীর নিকট গোপন করিয়া, হাসিয়া গান ধরিল। গাহিল;—

যাব না কালিন্দী জলে,
কালা দাঁড়ায়ে কদম তলে।

গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—:*:—

সম্বন্ধ।

এই সব ঘটনার পর হইতে নরেন্দ্রনাথ, ইন্দুমতীর কুটীরে আসা যাওয়া করিতে লাগিল। ক্রমশ তাহাদের ভিতরে ভিতরে বেশ একটু প্রণয়ও জন্মিয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ ইন্দুমতীকে দেখিয়া যাইয়া, বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে থাকে। ভাবে, এ রত্ন পাইলে, না জানি কত সুখী হইব? কতবার দেখিয়াছি, এখনও কতবার দেখিতেছি, তথাপি সেই চাঁদপানা মুখখানি দেখিতেই ইচ্ছা হয়। কেন যে হয়, বলিতে পারি না। এ সংসারে কত নয়নরঞ্জন রমণীয় বস্তু দেখিতেছি,—দেখিয়া ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছি। কোন বস্তু দেখিয়াই ত হৃদয়ে কষ্ট হয় না। বরং রমণীয় পদার্থ অবলোকন করিলে, হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব অতুলানন্দ জন্মে। কিন্তু, ইন্দুমতীর শুভ্র সরোজোপম মুখমণ্ডলের কোমল হাসিতে প্রাণে আঘাত লাগে কেন? আর যখন সেই মধুর হাসি বিলোকন করি তখনি বা আত্মবিভ্রম জন্মে কেন? সেই হাসি, সেই বসন্ত-প্রফুল্ল-কুসুমবৎ সুন্দর হাসি দেখিয়া, এখনও প্রাণে প্রাণে জ্বলিতেছি কেন? ইন্দুমতীর সেই সুন্দর মুখের কথা মনে পড়িলে প্রাণের ভিতর উদাস বায়ু হু হু করিয়া প্রবাহিত হয় কেন? এ বন প্রসূন। আমি গলে পরিতে পারিব কেন?

বনফুল, আপনি ফুটে, আপনি আবার ভগবানের পাদপদ্মে ঝরিয়া পড়ে কে তাহার অন্বেষণ করে? আমি দেখিয়াছি—প্রাণ হারাইয়াছি কেন দেখিলাম? কেন প্রাণ দিতে গেলাম? রামভদ্র আমাকে কেন এ প্রলোভনপূর্ণ রূপসাগরে নিক্ষেপ করিল? রামভদ্র, অসম্ভব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। কখনও কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না তবে আমার উপায় হবে কি? একি! এ সমস্ত আমি ভাবি কি আমি কি পুরুষ? আমার পুরুষত্ব কোথায়? ইন্দুমতী আমার কে আমি তাহার জন্য ভাবি কেন? সে বনের ফুল, বনেই থাকিবে বনফুল মানবের উপযুক্ত নহে! মানব, সে সব ফুল ভালবাসে না আবার নরেন্দ্রনাথ, ইন্দুমতীর কাছ হইতে সরিয়া গেলে ইন্দুমতীও কত কি ভাবিতে থাকে। ভাবিয়া কত আকুল হয়। সেও ভাবে, ফুল ফুটে, চাঁদ হাসে, তাতে মানুষ মজে কেন? ফুলের সুবাস নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ ব্যাকুল করে; সেটি কি মানুষের দোষ? আমার প্রাণ, অনলে ঝাঁপ দিতে চাহে—পুড়িয়া মরিবার ভয় করে না; তখন চিত্ত বশে রাখি কেমনে? মুখ বাঁধা যায়, কিন্তু, মন বাঁধা যায় না। শৈল, ইহা বুঝে না। কেবল, আমাকে বিদ্রূপ করে।

রামভদ্রও স্বচক্ষে, এই প্রণয় ঘটিত আচরণ অবলোকন করিল। দেখিয়া শুনিয়া মনে মনে ভাবিল, ইন্দুমতীর যৌবন-গাঙ্গে জোয়ার বহিয়াছে—প্রবল পূর্ণ বেগে। এখন আর বালির বাঁধ মানিবে না। ইন্দুমতীকে বড় ভালবাসি। এ বয়সে আর ঘরে রাখা যায় না। উচিতও নয়। এখন সুপাত্রে অর্পণ করাই যুক্তিসঙ্গত। পাত্রটি মিলিয়াছেও ভাল;—শান্ত, সুধীর, কর্ম্মঠ ও বলিষ্ঠ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

দেখিতেও পরম সুশ্রী, যেন কার্ত্তিকেয়। বিষয় বিভবের ত কথাই নাই,—যেন কুবের-ভাণ্ডার! ইহার চেয়ে সুপাত্র আর কি হইতে পারে?

এই সমস্ত ভাবিয়া, রামভদ্র, একদিন নরেন্দ্রনাথের পিতার নিকট উপস্থিত হইল এবং সন্তর্পণে বিবাহের প্রস্তাব করিল। রায়মহাশয়, শুনিয়াই প্রথমে অস্বীকার করিলেন। বলিলেন, "মেয়ের পিতা মাতা নাই; আত্মীয় স্বজন কেহই নাই; ছেলে শ্বশুর বাড়ী যাইয়া, দুই চারি দিন থাকিতে পারিবে না। বিশেষত সামাজিক প্রথাই বা কি প্রকারে অবহেলা করি? মেয়ে কোন কূলের তাহারও নিশ্চয় নাই।" এই সমস্ত কথার প্রত্যুত্তরে, রামভদ্র, নরেন্দ্রনাথ ঘটিত সমস্ত কথা, ইন্দুমতীর অনিন্দ্যসুন্দর শারদীয় পূর্ণচন্দ্রতুল্যমুখমণ্ডল; সুশ্রী অঙ্গ সৌষ্ঠব; উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রভৃতি অনেক কথা, সুন্দরভাবে সাজাইয়া বলিল। এবং ইহাও বলিল, যে দুকুলপুরে একবার মহামারী উপস্থিত হয়। সেই সময়, শত শত লোক মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। অনেকেই গ্রাম ছাড়িয়া যাইয়া, জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু, ধরণীধর বাবু, সপরিবারে গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াও বাঁচিতে পারিলেন না। পথিমধ্যে ধরণীবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইল। রামভদ্র, বলিতে বলিতে কাঁদিতে লাগিল। মৃত্যুকালে, ধরণীবাবু আমাকে বলিলেন, রামভদ্র, তুমি আমার ভৃত্য হইলেও এখন রক্ষাকর্ত্তা। তুমি আমার কন্যা ও রাম বাবুর কন্যাকে জীবিতকাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিও। এ ঋণ আমি শোধ করিতে পারিব না।" রাম বাবু ধরণী বাবুর বন্ধু ও প্রতিবাসী ছিলেন। তিনিও মহামারীতে সবংশে

নির্ব্বংশ হইয়াছেন। সেই হইতে দুকুলপুর গ্রাম ছাড়িয়া আসিয়া, কন্যাদ্বয়কে নিয়া আপনার আশ্রয়ে বাস করিতেছি। কন্যা দুটি, যে সৎকুলের, রামভদ্র, তাহারও অনেক নিদর্শন দিল।

রায়মহাশয় সে সকল কথা শুনিয়া কিছু নরম হইলেন। দুকুলপুরের ধরণী বাবুকে সকলেই ভালরূপ জানিতেন। গ্রামের মধ্যে ধরণী বাবু বর্দ্ধিষ্ণু ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। মহামারীতে তিনি যে একটী মাত্র কন্যা রাখিয়া, পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে সঙ্গে কালের করাল কবলে নিপতিত হন, এ কথাও সকলেই জানিতেন। কেবল জানিত না—কোথায় সে কন্যা আছে—কেইবা তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। অনেক অনুসন্ধানেও সে কথা কেহ জানিতে পারে নাই। এখন এই ইন্দুমতীই যে ধরণী বাবুর সেই কন্যারত্ন, ইহা জানিয়া, রায়মহাশয় বড়ই প্রীত—বড়ই আনন্দিত হইলেন। অনেক দিন যাবৎই সুন্দরী কন্যা খুঁজিতেছিলেন; কিন্তু, কোথায়ও মনের মতন পরমাসুন্দরী কন্যা ঘটাইতে পারেন নাই। এখন রামভদ্রের মুখে, ইন্দুমতীর রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া, দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। স্থির করিলেন, কন্যা দেখিয়া মতামত বলিবেন। কর্ত্তার কথায়, রামভদ্রের মনে কিছু ভরসা ভাবিল, রূপ দেখিয়া করিতে হইলে, এমন সুশ্রী কন্যা আর কোথায়ও পাইবে না। ঠিক হইল, পরদিন রায়মহাশয়, ইন্দুমতীকে দেখিতে যাইবেন।

বস্তুত, পরদিন রায়মহাশয়, গৃহিণীকে না বলিয়াই, গোপনে, কন্যা দেখিয়া আসিলেন। ইন্দুমতীর লোকললাম রূপলাবণ্য দেখিয়া অত্যন্ত ও আহ্লাদিত হইলেন। স্থির করিলেন, ইন্দুমতীকেই পুত্রবধু

করিবেন। কেবল গিন্নীকে একবার জিজ্ঞাসা করিবেন মাত্র। তাই, রাত্রিতে বড় গর্ব্ব করিয়া গিন্নীকে কহিলেন,

"দেখ, বৌটি যদি খুব সুন্দরী হয়; অবশ্য তোমার নাক চোকের ন্যায় নহে! তিলফুল তুল্য নাসিকা, পদ্মপলাশ তুল্য চক্ষু, ঠোঁট দুটি খুব পাতলা, দন্তপাতি মুক্তার ন্যায়; তবে তুমি সেই বৌ গৃহে আন কি না?"

গিন্নী মনে মনে ভাবিলেন, আজিও বুঝি, সে দিনের ন্যায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিবেন, তাই এত কথা। প্রকাশ্যে কহিলেন,

"আজিও আবার ঠাট্টা নাকি?"

কর্ত্তা, বড়ই হর্ষের সহিত কহিলেন,

"না। সত্যই অমন বৌ দেখে এসেছি।"

গিন্নী। ভাল, দেখা যাবে। কথা অনেকেই বলে—কিন্তু কাজে দেখি না। এনে দেখাতে পা'রলে বুঝিব বাহাদুরী!

কর্ত্তা। ছেলে কিন্তু শ্বশুর বাড়ী যাইতে পারিবে না। এ বৌ বনে ফুটেছে।

গিন্নী। তা হ'ক, বাট্। বাবার আমার কি খাবার প'রবার অভাব? বৌটি লক্ষ্মীশ্রী হ'লেই হ'ল। কোথায় এমন বৌ দেখে এলেন?

কর্ত্তা। নিকটেই।

তখন কর্ত্তা গিন্নীতে নরেন্দ্রনাথের বিবাহ সম্পর্কে নানা প্রকার কথোপকথন চলিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—০:*:০-

বিবাহ

বুধবার, নরেন্দ্রনাথের বিবাহ। অদ্য সোমবার, মাঝে একদিন মাত্র আছে। ইহার ভিতর আত্মীয় কুটুম্বে রায়বাড়ীর বাহির ও অন্দর মহল পরিপূর্ণ হইয়াছে। আজ হইতে দশদিন পর্য্যন্ত নাচ গান, আমোদ প্রমোদ হইবে।

বাহির বাড়ী, দুর্গাবাড়ী, নাটমন্দির, নাচঘর প্রভৃতি বিশেষ পারিপাট্যে সাজান হইয়াছে। নাচ ঘরের প্রত্যেক দুই থামের মাঝে, ছোট ছোট আট ডালের ঝাড়; এবং প্রত্যেক থামের গায়ে, যুগ্ম দেওয়ালগিরি। থামের প্রায় অগ্রভাগে সুন্দর সুন্দর স্বর্ণরঞ্জিত ফ্রেম সংযুক্ত সুদৃশ্য ছবি। ঘরের মধ্যস্থলে একটী বৈদ্যুতিক আলো; আলোটির দুই পার্শ্বে দুটি ত্রিশ ডালের ঝাড়,—আলোতে পরিপূর্ণ। নাচঘরটি দিবাময় বলিয়া প্রতীত হইতেছে। রোশনাইর বন্দোবস্ত প্রচুর।

বসিবার বন্দোবস্তও প্রীতিপ্রদ। সতরঞ্চের উপর অতি ফরসা চাদর পাতা। নাচ গানের প্রচুর জায়গা রাখিয়া, উভয় পার্শ্বে একই রকম ভুজশূন্য চেয়ার। চেয়ারগুলির মাঝে মাঝে দুই একখানা কৌচ ও গালিচা পাতা। উত্তর ও দক্ষিণের থামের সংলগ্ন করিয়া শ্বেত প্রস্তর বিনির্ম্মিত দুটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টেবিল রাখা হইয়াছে।

টেবিলের উপর সোণার আতরদান, গোলাপপাশ, পানের ডিবা প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে। সদর রাস্তার অগ্রভাগে অভ্রভেদী নহবত। নহবতের চূড়াতে ঝগ্ঝগার প্রকাণ্ড গরুড়পাখী,—দুইপক্ষ বিস্তার করিয়া যেন উড়িবার যোগাড় করিতেছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে আলো শ্রেণী—নক্ষত্র শ্রেণীর ন্যায় জ্বলিতেছে। আবার রাস্তার উভয় পার্শ্বে, কাগজের বিচিত্র বিবিধ প্রকার ছবি ও পতাকা। পতাকাগুলি পত্ পত্ করিয়া বায়ুভরে দুলিতেছে।

এ সমস্ত দেখিতে দেশীয় বিদেশীয় লোক দলে দলে আসিতেছে —দেখিতেছে—যাইতেছে। কোন কোন ছবি দেখিয়া, কেহ হাসিতেছে; কেহ কেহ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। লোকে লোকারণ্য; এত লোক! তামাসাও প্রচুর—নাচগান, থিয়েটার, যাত্রা, সার্কাস, ছায়াবাজী ও পুতুল নাচ। এ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অভিনয় হইতেছে। সকল বিষয়েই সুচারু বন্দোবস্ত। এত যে লোকের ঠেসাঠেসি মেশামেশি; তথাপি কাহারও দেখিবার আপত্তি নাই। যাহার যেখানে দেখিবার অভিপ্রায় হইতেছে, সে সেখানেই দেখিতেছে। দেখিয়া দেখিয়া, সকলে রায়মহাশয়কে যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছে। এই প্রকার ত হইয়াছে—বাহির বাড়ীর ব্যাপার। এখন অন্দর মহলের ব্যাপার দেখিলে হয় না?

অন্দর মহলেও খুব জাঁক। গিন্নী, তাঁহার ঘনিষ্ঠ ও দূরস্থ সংশ্রবের আত্মীয় কুটুম্ব আনিয়াছেন। পিসীর মাসীকে এবং তাহার শাশুড়ীর বেয়ান; বেয়ানের সঙ্গে আসিয়াছে—সাত ছেলে, পাঁচ নাতি ও ছয় নাত্নি। আরও আসিয়াছে,—মামা শ্বশুরের শালার ঘরে একটি

স্ত্রীলোক থাকেন; সেই রমণী, তাহার দুটি অবিবাহিতা কন্যা, তিনটি পুত্রবধু, ও একটি ছোট ছেলে। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে কেহই বাকী নাই; সকলেই আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রথমে আসিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, গিন্নী, তাহাদিগকেও সাতবার করিয়া, পাল্কী পাঠাইয়া, মাথার দিব্য দিয়া আনাইয়াছেন। গিন্নীর শৈশব সহচরী, একদিন গিন্নীকে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, যে তাহার ছেলের বিবাহে সে তাহাদের বাড়ী আসিবে। গিন্নী সেই সইকেও বৰ্দ্ধমান হইতে, খরচ দিয়া আনাইয়াছেন। গিন্নীর সই স্বামীসহ বৰ্দ্ধমানে থাকিতেন। কারণ, সয়ের স্বামী, বৰ্দ্ধমান কোর্টের একটি বিখ্যাত উকীল।

যাহাহউক, মঙ্গলবার প্রভাতে উঠিয়া, রমণীগণ, কেহ স্নান করিতে যাইতেছে; কেহ স্নানান্তে অলঙ্কার ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিতেছে; মলের রুণুঝুণু শব্দে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইয়াছে; কেহ বা অলঙ্কার পরিতে না পাইয়া স্বামী-নিন্দা করিতেছে।

গিন্নী, সকলকে প্রভাতের ভোজন করাইতেছেন। রামার মা, শ্যামার পিসী, বামার দিদি, যতীশের শাশুড়ি, সাতকড়ির জেঠী, তিনকড়ির বৌ, নকড়ির খুড়ী, বৃন্দার শালী, দক্ষিণার মাসী, দিগম্বরের মামি, কানায়ের বেয়ান, রূপার বোণ, সোণার মেয়ে, জগার ঠাকুর মা ও মাধার স্ত্রী প্রভৃতি স্ত্রীলোকগুলি, জিভ্ বাহির করিয়া, কোমরের কাপড় খুলিয়া, লুচি, কচুরী, সন্দেশ ও জিলাপি প্রভৃতি মিঠাই সামগ্রী খাইতেছে। রামার মায়ের পাতে

ভুলে "রসগোল্লা" পড়ে নাই; আর সকলের পাতেই পড়িয়াছে। তা দেখিয়া, রামার মা যা হইবার তা ত হ'লই; তারপরও বলিতে লাগিল, "গিন্নীর দেবার শ্রী দেখ!" নকড়ীর খুড়ী বড় সেয়ানা মেয়ে। সে গিন্নীর ভুল বুঝিতে পারিল। হাসিয়া রহস্যচ্ছলে রামার মাকে বলিল, "এরি ভিতর রসগোল্লাটি খেয়েছিস্; কি হাবাতি গা, তুই?" "তোমার মাথা খেয়েছি," বলিয়া রামার মা উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং নকড়ির খুড়ীকে যথেচ্ছ গালাগালি দিতে লাগিল। গিন্নী এ সংবাদ জানিতে পারিয়া, রামার মাকে বলিয়া কহিয়া, ঝগড়া নিবারণ করিলেন এবং একটীর বদলে পাঁচটি রসগোল্লা দিলেন। রামার মা তখন সকলকে দেখাইয়া দেখাইয়া, বেশী পরিমাণে জিভ বাহির করিয়া রসগোল্লাগুলি খাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে ত মঙ্গলবার কাটিয়া গেল। আজ বুধবার, বিবাহের দিন। অত্যন্ত ধুম্‌ধাম্। বাহির বাড়ীর কোথায়ও নাগ্‌রা টিকারা, ঢোল, সানাই, কাঁশি বাজিতেছে; কোথায়ও ইংরাজি ব্যাণ্ড বাজিতেছে; দন্‌ফলা নাচিতেছে; এবং নহবতে রোশনচৌকি হইতেছে। তুমুল বাদ্যোদ্দামে, গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতেছে। দুপুর আসিল। নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত লোক, দলে দলে পিপীলিকার জাঙ্গালের ন্যায় খাইতে আসিতেছে—খাইতেছে—খাইয়া যাইতেছে। এদিকে কাকপালও ঝাঁকে ঝাঁকে আসিতেছে—বসিতেছে—ডাকিতেছে এবং বন্দুকের শব্দ শুনিয়া উড়িতেছে—বসিতেছে। বাড়ীর কুকুরগুলি, খাইয়া খাইয়া, আর পেটের ভারে চলিতে পারিতেছে না। তথাপি অন্য কুকুরগুলিকে খাইতে দিতেছে না।

তাহারা কিন্তু পাকেপ্রকারে খাইতেছে,—আর মারামারি করিতেছে কোন কোন অতিরিক্ত ভোজী কুকুরের জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া ঝুলিতেছে

রায়মহাশয়, এদিক ওদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সকলের তত্ত্বাবধা করিতেছেন। এ সকল কার্য্য করিতে করিতে শরীর দিয়া ঘ বাহির হইতেছে। গিন্নী, বাড়ীর ভিতর হইতে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে কর্ত্তাকে আসিয়া কিছু জলখাবার খাইয়া যাইতে বল। কর্ত্তা সংবাদদাতার নিকট বলিয়া দিলেন, "আজ আমি নিরম্বু উপবা থাকিব ; গিন্নীর ক্ষুধা পেয়ে থাকিলে, তাঁহাকে যাইয়া খাইতে বল।" দেওশালী, পাঁড়েঠাকুর প্রভৃতি সকলে লাল বনাতের জাম পেণ্টুলন পরিয়াছে ; মাথায় শালু কাপড়ের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাগড়ী বাঁধিয়াছে এবং সঙ্গিন সংযুক্ত বন্দুক হাতে করিয়া চারিদিকে ঘুরিতেছে—হাঁক দিতেছে—মাঝে মাঝে বন্দুক ছাড়িতেছে।

দিন কাটিয়া গেল। রাত্রি আসিল। তখন তামাসা দেখিবা নিমিত্ত, একটা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। লোকগুলি, একবার থিয়েটারের কাছে, একবার পুতুল নাচের কাছে, একবার সার্কাসের কাছে আসিতেছে—দেখিতেছে—দেখিয়া আবার যাইতেছে। কেহ কেহ দেখিতে না পারিয়া গোলমাল করিতেছে ;—সম্মুখের লোকগুলিকে ঠেলিতেছে—ধাক্কা দিতেছে। কর্ম্মচারী মহাশয়গণ, সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদ পরিয়া, গোলমাল নিবারণ করিতেছেন। পাঁড়ে ও দোবেঠাকুরেরাও গোলমাল থামাইবার নিমিত্ত, লোকগুলিকে লাঠির গুঁতা মারিতেছে। কিন্তু, কিছুতেই গোল নিবারণ হইতেছে না বরং ইহাতে আরও গোল বাড়িতেছে।

এদিকে রাত্রি দশটার সময়, শুভলগ্নে শুভক্ষণে, নরেন্দ্রনাথে হস্ত ইন্দুমতীর বিবাহ হইয়া গেল।

এতদিনে রামভদ্রের অভিলাষ ও চেষ্টা সফল হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দম্পতি-সম্মিলন।

জ্যোৎস্না রজনী। এখন আর জোছনার বালসুলভ চাঞ্চল্য নাই। পূর্ণ যৌবনের পূর্ণবেগ পূর্ণভাবে পড়িয়াছে। যৌবন-লাবণ্য, বৃক্ষের লতায় পাতায়, ফুলে ফলে নিপতিত হইয়াছে। এবং চিক্ মিক্ করিতেছে। রজনী কবরীতে তারার মালা পরিয়াছে। জগত, সুষমায় ঢল ঢল!

প্রায় একমাস অতীত হইল, নরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আজ পরিষ্কার রজনী দেখিয়া, নরেন্দ্রনাথ, ইন্দুমতীর সহিত খিড়কীর বাগানে আসিয়া উপনীত হইল এবং উভয়ে প্রীতিপ্রফুল্লান্তঃকরণে ধীরে ধীরে বেড়াতে আরম্ভ করিল। ভ্রমণ করিতে করিতে ইন্দুমতী, বাগানের রমণীয় শোভা পরিদর্শন করিতে লাগিল। দেখিল, সারি সারি কতকগুলি পুষ্পবৃক্ষ,—সুন্দর সুন্দর প্রস্ফুটিত ফুল ও মুকুলে পরিপূর্ণ। ভ্রমর, বড় প্রবঞ্চক। বংশীরবে মত্ত কুরঙ্গের ন্যায়, মধুগন্ধে, এফুলে ওফুলে উড়িতেছে—বসিতেছে। যেন আপনার প্রবল প্রেম-প্রাবল্য জানাইতেছে। ছি! ভ্রমর, তুমি এই প্রকার আচরণ করিও না। কেহই তোমার চাঞ্চল্যভাব ও দংশন যাতনা ভালবাসিতেছে না। কামিনী, হোক্ কোমল

কামিনী, তবু সহজে কাহাকেও আপনার প্রাণ দিতে চাহে না। ভ্রমর, কামিনীর কাছে সোহাগ জানাইতে আসিবামাত্র, সে ঝাড়া দিয়া বলিল, মুখের সোহাগ চাহি না, প্রবঞ্চক দূর হও। ভ্রমর তখন ভোঁ ভোঁ ভোঁ করিয়া, অভিমানিনী কেতকীর নিকট উপস্থিত হইল। কেতকী, মুখ মলিন করিয়া, কণ্টকাকীর্ণ ঘোমটা টানিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, শঠ, আজ তোমাকে কাঁদাইয়া ছাড়িব। ভ্রমর কিন্তু তাহা বুঝিল না। সে কেতকীর ঘোমটা টানিয়া মুখ দেখিবার জন্য যেমন বল প্রয়োগ করিল, অমনি সেই কণ্টকাকীর্ণ ঘোমটায় তাহার বাহু জড়াইয়া গেল। তখন ভ্রমর অস্ফুটস্বরে কেতকীর নিকট কত মিনতি, কত কাঁদিতে লাগিল:—তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া ছুটিয়া পলাইল। নরেন্দ্রনাথ ও ইন্দুমতী, ভ্রমরের লাঞ্ছনা ও মিনতি দেখিয়া হাসিতেছিল।

ইন্দুমতী হাসিতে হাসিতে কহিল,

"নাথ, ফুল ফোটে কেন?"

নরেন্দ্র। মরিতে!

ইন্দুমতী। তবে এ ফুটায় লাভ কি?

নরেন্দ্রনাথ, ঈষৎ হাসিল। কহিল,

"সকলকে সৌরভ দানই লাভ।"

ইন্দুমতী, একথায় আর কিছু না বলিয়া ফুল তুলিতে চলিল। নরেন্দ্রনাথ, দূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, ইন্দুমতীর ফুলতোলা অবলোকন করিতে লাগিল। দেখিল, প্রফুল্লিত পুষ্পবনে যেন স্বর্গীয় কিন্নরী আসিয়া, অতীব যত্নসহকারে ফুল তুলিতেছে। ইন্দুমতী, একখানা

কাল চৌড়া ফিতা পাড় কাপড় পরিধান করিয়াছিল; কাপড়ের পাড়টি কোমরের উপর জড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহা দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ ভাবিল, একখানা শুভ্র স্তম্ভের গায় যেন কাল ভুজঙ্গ বেড়িয়া বেড়িয়া উঠিতেছে। আর ইন্দুমতীর শিথিল চলন-ভঙ্গি দেখিয়া ভাবিল, মদোন্মত্ত রতিদেবী যেন কামদেবের চিন্তায় ভগ্নহৃদয়ে, ধীরে ধীরে, একটির পর একটী করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে চলিয়াছেন।

ইন্দুমতী, ফুল তুলিয়া, নরেন্দ্রের নিকট আসিল। বলিল,

"এসো; আমরা বসি।"

নরেন্দ্র। কোথায়, ইন্দু?

ইন্দু। কেন? ঐ তরুতলে।

ইন্দুমতী, সম্মুখস্থ মাধবীলতার গাছটি দেখাইয়া দিল।

তারপর, উভয়ে মাধবীলতার তলদেশে গিয়া বসিল। মাধবীলতার তলাটি বড় সুন্দর! নবঘনশ্যামল তৃণাবৃত; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখিলে বোধহয়, একখানা সবুজ বর্ণের কার্পেটের উপর যেন মাধবীলতার গাছটি, রোপণ করিয়া রাখিয়াছে। ইন্দুমতী তরুমূলে বসিয়া মালা গাঁথিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ, ইন্দুমতীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। পাতার ভিতর দিয়া চাঁদের সুস্নিগ্ধ কিরণ আসিয়া, ইন্দুমতীর মুখমণ্ডলে নিপতিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ, শুইয়া শুইয়া, অনিমিষ লোচনে, ইন্দুমতীর চন্দ্র-কিরণ-বিধৌত-প্রফুল্ল-সরোজোপম-মুখখানি, দেখিতে লাগিল: দেখিতে দেখিতে কতবার যে তাহার আত্ম-বিভ্রম জন্মিল, কে বলিবে?

নরেন্দ্রনাথ ইন্দুমতীর রূপ-সাগরে ডুবিল—আর উঠিল না।

ইন্দুমতী, মালা গাঁথিতে গাঁথিতে কাঁদিতেছিল। কেন কাঁদিতেছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু ইন্দুমতীর অশ্রুকণায় মালার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিল। ফুলের প্রতি পাপড়িতে অশ্রুবিন্দু বিন্দু বিন্দু নিপতিত হওয়ায় মুক্তার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। হঠাৎ একটী উত্তপ্ত অশ্রুবিন্দু নরেন্দ্রনাথের শরীরে পড়িল। নরেন্দ্রনাথ, চমকিয়া উঠিয়া বসিল। ইন্দুর রূপসাগরে আর ডুবিয়া থাকিতে পারিল না। পরে, ব্যগ্রতার সহিত বলিল,

"ইন্দু, একি! কাঁদ্‌ছ কেন?"

ইন্দুমতী, নীরব। নরেন্দ্রনাথ, পুনরায় কহিল,

"ইন্দু, বল, কি হয়েছে।"

ইন্দুমতী, এবার অঞ্চলে চক্ষু মুছিল। কহিল,

"কৈ? না।"

এই বলিয়া, নরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে একবার তৃষিত চাতকের ন্যায় চাহিয়া, ভুজ পাশে জড়াইয়া ধরিল। নরেন্দ্রনাথ, কহিল,

"ছি! মিথ্যা কথা বলিতে নেই।"

ইন্দুমতী, অপ্রতিভ হইল। মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিল। ভাবিল, স্বামী পরম দেবতা। দেবতার কাছে মিথ্যা কথা কহিলে কি নিস্তারের পথ আছে? ভাবিয়া একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। বলিল,

"একটী কথা মনে পড়িল।"

নরেন্দ্রনাথ, সমুৎসুক চিত্তে কহিল,

"কি কথা, ইন্দু?"

ইন্দুমতী, বাষ্পাকুলিতলোচনে, কাতরকণ্ঠে কহিল,

“আমি চিরদুঃখিনী; এত বড় সুখ পোড়াকপালে টিঁকিলে হয়।”

ইন্দুমতীর গণ্ড বাহিয়া, একটী অশ্রু ঝরিল, আর একটী ঝরিল। এক, দুই, তিন অনেকগুলি ঝরিল। কুসুমকোরকে আর যেন নীহার ধরে না।' কি সুন্দর! দেখিতে বড়ই সাধ হয়। বিধাতা কেন আমাকে অশ্রুময় করিলেন না? অশ্রুর লীলা হইলেই কি হয়? তেমন প্রশান্ত প্রফুল্ল-হরিণ-আঁখি দুটী পাওয়া চাই। আবার তেমন ফুটন্ত, কোমল গোলাপী গণ্ডখানি হওয়া চাই। এক কথায়, ইন্দুমতীর লাবণ্য-সমুদ্রে প্রেমের প্লাবন, কোমল বয়ানে ললিত-লোচনের লীলা—কার না দেখিতে অভিলাষ হয়?

ইন্দুমতী, আমরা জানি, তুমি কাঁদিতে আসিয়াছ। কাঁদিবে, তাতে ভয় কি? জগৎ, যে অশ্রুডোরে বাঁধা।

ইন্দু, আকাশ কাঁদে, সাগর কাঁদে, পাষাণ কাঁদে; কাঁদিয়াই জগতের শান্তি! অশ্রু না থাকিলে, এ সংসার বাঁচিত না। পাষাণের বুকে ঝরণা আছে বলিয়াই পাষাণ বাঁচিয়া আছে। উহার হৃদয়াভ্যন্তরে যে দগ্‌দগি, তা তুমি আমি কি বুঝিব? আকাশ সারাদিন জ্বলিয়া মরে; মাঝে মাঝে শ্যামল জলধর আসিয়া সান্ত্বনা করে। সাগরের উদ্বেলিত প্রাণখানি দেখিয়া, মনে করিও না, সাগর উল্লাসে ফাটিয়া পড়িতেছে। সাগরের হৃদয়ে ডুবিয়া দেখ, সেও জ্বলিয়া জ্বলিয়া কাঁদিয়া থাকে। তাহার উপরে নীচে কেবলই জ্বালাতন! সাধে কি সাগর গর্‌ গর্‌ করিয়া কাঁদে?

আর তুমি আমিও কাঁদি। আমরা কাঁদিবার সময় জানি। সহানুভূতি দেখাইবার জন্য একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেও পারি। ইন্দু, তুমি যোগিনী, হাসিবে কেন? হাসি মরিয়া যায়। ফুল, মরিবার জন্যই হাসে; চপলা, মরিবার জন্যই জ্বলে; শিশির হাসিয়াই মরিয়া যায়। অতএব ইন্দুমতী, তুমি কাঁদিও। আমরা তোমাকে জগতের মহারাণী বলিব!

নরেন্দ্রনাথ, ইন্দুমতীর কপোল বাহিয়া যে অশ্রু পড়িতেছিল তাহা মুছাইয়া দিল। পরে, কহিল,

"ছি! ওসব কথা ভাবিতে নেই, ইন্দু।"

ইন্দুমতী, আর কিছু বলিল না।

নবম পরিচ্ছেদ

—:০:—

সূত্রপাত।

মানুষের বিপদ, পদে পদে। আপদ বিপদ, প্রতিনিয়ত মাথার উপর চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। কখন কি হয়, বলা যায় না। ভবিষ্যৎ,—ঘন তিমিরাচ্ছন্ন, দুর্ভেদ্য!

গোবিন্দপুরের জমিদার—গোবিন্দবন্ধু ঘোষ। গোবিন্দপুর ও রাসিকান্না পরস্পর নিকটবর্ত্তী গ্রাম। এ পর্য্যন্ত রায়েদের সহিত ঘোষেদের পুরুষানুক্রমে সদ্ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের বিবাহের পর, ঘোষেদের প্রজার সহিত, কোন জমির সীমানা লইয়া, রায়দের প্রজার সঙ্গে একটী গুরুতর বিবাদ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। সেই সূত্রে উভয় পক্ষে বিশেষ মনোবাদ চলিতে থাকে। নিমন্ত্রণামন্ত্রণ, খাওয়া দাওয়া, আলাপব্যবহার পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়; ক্রমশ শত্রুতা বাড়িতে থাকে। এমন কি একপক্ষের লোক অপর পক্ষের লোকের সহিত এক-পথেও চলে না। এই মনোবাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোষেরা রায়দিগকে কয়েকটি জাল মোকদ্দমায় অস্থির করিয়া তুলে। কিন্তু, ধর্ম্মের জয় চিরদিনই। ঘোষেরা যতগুলি মিথ্যা

মোকদ্দমা করিয়াছিল; বিচারালয়ের সুবিচারে সকলগুলিতেই পরাজিত হয়। সেই সকল মোকদ্দমায় ঘোষ জমিদারের মেয়াদ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কেবল রায়েদের তাচ্ছল্যে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। কারাগারে দেওয়া রায়েদের ইচ্ছা ছিল না।

যদিও মেয়াদ দেওয়া, রায়েদের অভিলাষ ছিল না; তথাপি, ইহাতে ঘোষেদের অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কাজেই ঘোষেরা হীনবল হইয়া পড়িল। অর্থে, জোর ও তেজ বৃদ্ধি হয়—অসৎ পাত্রে পড়িলে। অসৎ পাত্রে অর্থ বেশীদিন স্থায়ীও হয় না। ঘোষেরা এত যে নিস্তেজ হইয়া পড়িল, তবুও নানা রকমে বিপক্ষীয় প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতে ছাড়িল না। শেষে, রায়মহাশয়, একটী সামান্ত মোকদ্দমায়, ঘোষদিগের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি নিজ আয়ত্বে আনিলেন। সেই হইতে ঘোষদের দিনান্তে এক সন্ধ্যাও জুটিয়া উঠে না।

জ্বর বিকারে ও খাদ্যাভাবে গোবিন্দবন্ধু ঘোষের মৃত্যু হয়। মৃত্যু শয্যায়, ঘোষ মহাশয়, পুত্রকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন যে, যে প্রকারে হউক, রায়েদের বংশে বাতি দিতে কেহ না থাকে, এমন করিবে। যদি তাহাও না পার; তবে ছলে বলে, কলে কৌশলে, ঐ বংশে এমন একটী কলঙ্ক দিবে, যাহাতে পৃথিবীর লোক পর্য্যন্ত হাসে। পুত্র, পিতার আদেশ প্রতিপালন করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল।

প্রতুল, গোবিন্দবন্ধু ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। পিতার মৃত্যুর পর, পিতার সুপুত্র, রায়েদের সহিত অন্য কোন প্রকারে না পারিয়া কলঙ্ক দিবার সুযোগ দেখিতে লাগিল। সুযোগ ঘটিতে

সূত্রপাত।

বিলম্ব হয় কি ?

না।

কেন ?

এটি যে কুপথ !

কুপথ, বড় সরল।

দশম পরিচ্ছেদ

——••:••——

গৌরমণি নাপিতানী।

গৌরমণি মানুষ—জাতিতে অবলা। এ পর্য্যন্ত জানা ছিল। নামের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল কি না "তত্ত্বকোষে," একথা লেখা নাই। গৌরমণির সহিত গৌরাঙ্গের কোন সম্পর্ক ছিল না; কিম্বা গৌরমণি বলিয়া কোন মণিমাণিক্য, এ জগতে কেহ কখন দেখিতে পায় নাই—ইহা আমরা বেশ অবগত আছি। গৌরমণি, বিধবা—কেন না, সাদা কাপড় পরিত, সিন্দুর পরিত না। বটবৃক্ষ যেমন তেল সিন্দুর পরিয়া থাকে; গৌরমণি আদৌ তাহা পরিত না। গৌরমণির বর্ণ,—চতুর্বর্ণের মধ্যে সে কোন্ বর্ণের, কেহই তাহা ঠিক করিতে পারিত না; দুরূহ শব্দের অর্থে লেখা ছিল, গৌরমণি চতুর্বর্ণের আভাযুক্ত ঈষৎ গাঢ় নীল। গৌরমণির নাক—সে নাক দেখিয়া, নাকচাঁদ পাগল; অমনি সে এ নাকের নক্সা আঁকিয়া, তেরিটি বাজারে বিক্রয় করিতে লাগিল। আর চক্ষু—ঐ চক্ষুর কাছে রর্জসের ক্ষুরের ধার লাগিত না; সে অক্ষি কত পক্ষীকে পিঞ্জিরায় পুরিয়াছে; হর্য্যক্ষও এ অক্ষি দেখিলে হারিয়া যাইত; এবং এ যুগল গবাক্ষ গোলকের

আলোকে লোকের চক্ষে ধাঁধাঁ ও তাক্ লাগিত। গৌরমণির কণ্ঠনালী ছিল। *Anatomy* দেখিয়া ইহা এক রকম ঠিক করিয়া লওয়া হইয়াছে। সেই কণ্ঠনালী দিয়া, গানের গড্ডলিকা প্রবাহ প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে প্রবাহিত হইত। সে প্রবাহে যে আসিয়া পড়িত, সেই ভাসিয়া যাইত। সকলেই বলিত, গৌরমণি "সিদ্ধহস্ত"। যাহা ছুঁইত, তাহাই সিদ্ধ হইয়া যাইত। ভাত ব্যঞ্জন—এমন কি মানুষ পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়া যাইত; ঢোল ত খোল্। তবলা ত তরকারীর মধ্যে!! গৌরমণির এত গুণ, এ গুণের জোরে বড় বড় পান্‌সি টানিতে পারিত।

একদিন গভীর রাত্রিতে গৌরমণি নিজে নিজে গান করিতেছে; এমন সময়, একটী লোক আসিয়া কপাটে আঘাত করিল। গৌরমণি, আঘাতের শব্দ শুনিবামাত্র, ষাঁড়ের ন্যায়, নাকের ডাক তুলিয়া দিল। ভাণ—সুষুপ্তির! উপর্য্যুপরি দরজায় আঘাত হইতে লাগিল। গৌরমণি, তখন আর হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না। মুখের ভিতর অঞ্চলের অর্দ্ধখানা কাপড় গুঁজিয়া দিয়া ধীরে ধীরে হাসিতে লাগিল। কতকক্ষণ পর বলিল, "রাত্রি দিন কেবলি ঠক্ ঠক্। পোড়ামুখদের নিমিত্ত একটুও ঘুমাবার যো নেই। এবার চৌকিদার ডাকিব নাকি?"

চৌকীদারের কথা শুনিয়া বাহিরের লোকটি অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইল। পরে, ধীরে ধীরে বলিল,

"গৌর, গৌরমণি আমার! কপাট খোল; আ-মি—"

গৌরমণি, জন্মেও আর এমন সুমধুর সম্বোধন শ্রবণ করে নাই।

"গৌরমণি আমার" এ কথাটি তাহার প্রাণে এমন বাজিল যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন খসিয়া পড়িবার উদ্যত হইল। গৌরমণি, কপাট খুলিতে গেল বটে, কিন্তু খুলিতে পারিল না। কপাটের অর্গলে হাত লাগিয়া রহিল। শীঘ্র শীঘ্র খুলিবার নিমিত্ত, কতবার চেষ্টা করিল; একবারও কিন্তু পারিল না! অনেক চেষ্টার পর, অর্গল খুলিল সত্য; তবুও দেহের অবসন্নতা ঘুচিল না। লোকটি, কপাট খুলিবামাত্র, ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। গৌরমণি, আগন্তুক লোকটীকে চিনিত; দেখিয়াই কি যেন হইয়া গেল। ভাবিল, আজ তাহার সুপ্রভাত! সুপ্রভাত কি কুপ্রভাত পরে বুঝা যাইবে।

আগন্তুক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিয়াই, গৌরমণিকে কপাটে অর্গল দিতে বলিল। গৌরমণি কিন্তু উদ্ভ্রান্ত চিত্তে, অগ্রেই অর্গল দিয়া বসিয়াছিল। কাজেই আর অর্গল দিতে হইল না। লোকটি, গৌরমণির হাত ধরিয়া তাহার নিকটে বসাইল। এ হাত ধরায় গৌরমণির আত্মপুরুষ আরও ধড়ফড় করিতে লাগিল। সম্মুখে বসিলে পর, লোকটী গৌরমণির কাণে কাণে কি কথা কহিতে লাগিল। কথা কহিতে কহিতে, অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। কথা কহিবার সময়, কথকের মুখ, গৌরমণির কূপ-কপোলে লাগিয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু ইহাতে না কি গৌরমণি মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হইয়াছিল! সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন।

গৌরমণি, লোকটির সমস্ত কথা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিল। কথাগুলি শুনিয়া, মনকে দৃঢ় রজ্জুতে বাঁধিয়া, ভাবিতে আরম্ভ করিল। ভাবিল, ইহার কার্য্য করিব। এ কার্য্যের জন্য প্রাণ দিতে হয়

তাহাও দিব। এ কার্য্যের প্রতিদানে অর্থ ধন কিছুই অভিলাষ করি না। কেবল—

গৌরমণি, আর ভাবিতে পারিল না। সহসা গৌরমণির মনের ভিতর নানা প্রকার প্রশ্নোত্তর হইতে লাগিল। প্রশ্ন হইল,

"হৃদয়ে বসিবে কি?"

উত্তর। বসিলে বসিতে পারে; কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত।

প্রশ্ন। কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত যে বসিবে, তাহার বিশ্বাস কি?

উত্তর। বিশ্বাস আর কি? বিশ্বাস—আজিকার আগমন।

প্রশ্ন। ভাল; অদ্যকার আগমনে এমন কি আছে, যে বিশ্বাস করিতে পার?

উত্তর। (এ সময় গৌরমণির মুখে ঈষৎ হাসির রেখা পড়িল।) কি আছে? না আছে কি? সকলি আছে—হিংসা দ্বেষ; এমন কি একঘরের সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত আছে!

প্রশ্ন। কার্য্যোদ্ধার করিয়া যদি চলিয়া যায়?

উত্তর। কোথায় যাইবে?

প্রশ্ন। যেখানে তাহার অভিরুচি।

উত্তর। বল কি? গৌরমণির হাত ছেড়ে পালাবে? তা পারিবে না। অসম্ভব।

গৌরমণির কপাল কুঞ্চিত হইল।

প্রশ্ন। তুমি কি করিবে? তুমি ত আর জজ বাহাদুর নও কিছু করিতে পারিবে?

উত্তর। আমি জজ নই, বাহাদুরও নই—নরপিশাচী! (দন্তে

দন্তে পেষণ করিয়া) হৃদয়ের শোণিত পান করিব!!

প্রশ্ন। সে বড় কঠিন কার্য্য; পারিবে?

উত্তর। খুব পারিব; খুব পারিব।

গৌরমণি, এখানে উল্লসিত হইল।

প্রশ্ন। ঠিক?

উত্তর। ঠিক্, ঠিক্, ঠিক্।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত লোকটি, গৌরমণির মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল। সময় সময় গৌরমণির মুখ ভঙ্গি দেখিয়া, ভীত ও বিচলিত হইতেছিল। কিন্তু, গৌরমণি, যখন হাসিয়া বিশেষ আশ্বাস দিয়া কহিল যে, প্রাণ দিয়াও তাহার কার্য্য করিবে; তখন আনন্দে বড়ই উৎফুল্ল হইল। পরে, প্রফুল্লমনে, সেদিন বাড়ী ফিরিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গৌরমণির পর্য্যালোচনা।

প্রভাত হইল। গৌরমণি, শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া, রায়বাড়ী অভিমুখে চলিল। কেন চলিল বলিতে পারি না। অবশ্য কোন উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য ভিন্ন কার্য্য হয় না। গৌরমণির বাড়ী, আর রায়বাড়ী, বড় বেশী ব্যবধান নহে। বড় জোর দশ পোনর মিনিট। গৌরমণি, অতি দ্রুতবেগে হাঁটিয়া, রায়বাড়ীতে প্রবেশ করিল। তখন বেলা প্রায় দুই দণ্ড হইয়াছে। গিন্নী, উঠিয়াছেন মাত্র। বাড়ীর অন্যান্য সকলেই গিন্নীর অগ্রে উঠিয়াছে। গিন্নী, গৌরমণিকে অতি ভোরে দেখিয়া কহিলেন,

"কি গা, গৌরমণি, এত দিন কোথায় ছিলি? বাবার বিয়ের পর, একদিনও ত দেখি নেই।"

গৌরমণি, রায়েদের বাড়ীর নাপিতানী নয়। যদিও বাড়ীর নাপিতানী না হউক, তথাপি গিন্নী, গৌরমণিকে বড় স্নেহ করেন। গৌরমণি, সদা সর্ব্বদা রায়বাড়ীতে যাতায়াত করিয়া থাকে; কেহ বাধা দিতে পারে না। সে কেবল গিন্নীর নিমিত্ত।

গৌরমণি, গিন্নীর কথা শ্রবণ করিয়া, মৃদুভাবে বলিল,

"সে দিন মাসী-মা এসেছিলেন। তিনি বাড়ী যাবার সময়, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। আজ প্রায় ছ'মাস পর, বাড়ী এসেছি। এসেই আপনার সঙ্গে দেখা করিতে এলেম।"

গৌরমণি, সকলি মিথ্যা কথা বলিল। কারণ, এ সংসারে গৌরমণির আপনার বলিতে কেহ নাই। গৌরমণি, বাড়ী ছাড়িয়া কোথায়ও কোন দিন যায় নাই, মরণ পর্য্যন্ত যাইবেও না। যাইবার স্থান থাকিলে ত! বাড়ীই, নাপিতানীর সর্বথাসর্ব্বস্ব। গিন্নী, সরল মানুষ, নাপিতানীর কথাই বিশ্বাস করিলেন। কহিলেন,

"আজকাল বুঝি, তুই আমাদের বৌ মাকে দেখিস্ নেই। মা, দেখ্ মেয়ে, যেন সোণার প্রতিমা! মা, আমার লক্ষ্মী সতী।"

প্রকৃতপক্ষেই ইন্দুমতীর লাবণ্য যেন শ্রাবণের জলের ন্যায় উথলিয়া উথলিয়া পড়িতেছিল। যৌবনে, নায়ক সংস্পর্শে নায়িকার রূপ-লাবণ্য বৃদ্ধি পাইয়াই থাকে। ইন্দুমতীরও বাড়িয়াছে। গৌরমণির নিকট এ প্রশংসা ভাল লাগিল না। সে কাহারও প্রশংসা শুনিতে কি সুখ দেখিতে পারে না। অন্যের সুখে তাহার গাত্রদাহ জন্মে। গিন্নীর কথায় ভ্রূকুঞ্চিত করিল। মনে মনে ইন্দুমতীর রূপে ছাই দিল—আর কত কি করিল। পরে, প্রকাশ্যে বিকৃতস্বরে কহিল,

"কৈ, বৌ-মা?"

বলিয়াই খুক্ খুক্ করিয়া কয়েকবার কাশিল।

গিন্নী, বুঝিল, কাশি এসেছে বলিয়াই স্বরটি বিকৃত হইয়াছে।

কিন্তু, গৌরমণির দুষ্টামি বুঝিলেন না। কহিলেন,

"এখনো উঠে নাই বুঝি। মা, আমার সমস্ত দিন কায করে। এখনি উঠিবে; একটু বস্ না। বাড়ী যাবার সময় চাল ডাল নিয়ে যাস্।"

গৌরমণি, যখনি রায়বাড়ীতে আসে; গিন্নী তখনি গৌরমণিকে চাল-ডাল দিয়া থাকেন। পূর্ব্ব প্রথামত, আজিও দিতে প্রতিশ্রুতা হইলেন। গৌরমণি, নিতান্ত নিরীহ ভাব দেখাইয়া বলিল,

"চাল-ডালের জন্য কি? আপনাদের খেয়েই সাত পুরুষ মানুষ হয়েছি। আপনি যান; আমি ক্ষেতির কাছ থেকে আসি।"

ক্ষেতির পূর্ণ নাম—ক্ষেত্রমণি। গৌরমণি, তাচ্ছল্য ভাবে ক্ষেতি বলিয়া ডাকিয়া থাকে। ক্ষেত্রমণি, গিন্নীর দাসী।

তখন গৌরমণি, অন্দরমহলের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোথায়ও ইন্দুমতীকে খুঁজিয়া পাইল না। বস্তুত ইন্দুমতীর অন্বেষণ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। "ক্ষেতির কাছ থেকে আসি" এটিও ফাঁকি। সহসা উঠান ঝাঁট দিতে দিতে, ক্ষেত্রমণি আসিয়া, গৌরমণির সম্মুখে পড়িল। ক্ষেত্রমণিকে দেখিয়াই, কেমন একটা হাসি দিল। পরে, কহিল,

"কি গো, বোন! এখন বুঝি তোদের সকালে ঘুম ভাঙ্গে না? বড় লোকের বাড়ীতে থাকিতে থাকিতে, বড় লোক হয়ে পড়েছিস্ বুঝি?"

ক্ষেত্রমণি, বড় নির্ব্বোধ মেয়ে মানুষ। গৌরমণির বিদ্রূপ বুঝিল না। কহিল,

"কেন, বোন? আমরা ত খুব সকালে উঠেছি। তুমি কখন এলে?"

গৌরমণি, কতই যেন আপ্যায়িত ভাবে বলিল,

"সে কথায় কাজ কি, বোন। তোমাদের যে দেখা পেলেম, এই আমার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি।"

ক্ষেত্রমণি ভাবিল, কতই যেন তাহার অপরাধ হইয়াছে। নিতান্ত শিথিল ও সরলভাবে কহিল,

"আমরা ভাই দাসীবান্দি মানুষ। অবসর পেলে ত দেখা করিব? পরের খাটুনি খেটেই আমাদের জীবন গেল।"

এই বলিয়া, উঠান ঝাঁট দিতে দিতে চলিয়া যাইতে লাগিল। গৌরমণি আবার কহিল,

"একটু ব'স না, ভাই। এতদিন পর দেখা হ'ল; দুটি সুখ দুঃখের কথা বলিতে নেই কি?"

ক্ষেত্রমণি। আমাদের আবার সুখদুঃখ কি, বোন?

গৌরমণি দেখিল, ক্ষেত্রমণি ভালরূপ আলাপ করিতেছে না। আলাপ করিবার যেন অভিরুচি মাত্র নাই। তখন আপন উদ্দেশ্য সাধনার্থ কহিল,

"বৌ কোথায় গা, বোন?"

বলিয়াই মুখভঙ্গি করিল। ক্ষেত্রমণি তা দেখিল না। বলিল,

"খিড়কীর বাগানে। বড় সুন্দর বৌ, বোন!"

গৌরমণি তখন অতি দ্রুতপদে খিড়কীর বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, ইন্দুমতী সেখানেই আছে। গৌরমণি,

সম্মুখে আসিয়া, ঈষৎ নাক টানিয়া কহিল,

"কি গো, বৌ? এখানে কেন? বড় রাণী সেজে যে বসে আছ!"

ইন্দুমতী, অনন্যচিত্তে ফুল তুলিতেছিল। গৌরমণির কথা শুনিতে পাইল না।

গৌরমণি, রাগিল। অতি সহজে রাগা—তাহার একটা স্বভাব দোষ। পরে, কর্কশভাবে কহিল,

"মাগির দেমাক দেখ। এ দেমাকে ছাই পড়ুক। বড়লোকের বৌ হয়ে অহঙ্কারে মাটিতে পা ফেলিতে চায় না। এ অহঙ্কারে নিপাত যাও—শীঘ্র নিপাত যাও।"

ইন্দুমতী গৌরমণিকে চিনে না। রায়বাড়ীতে আসিয়াও কখন দেখে নাই। কাজেই অপরিচিতা গৌরমণির কটু কর্কশ কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দুমতীর চোখে জল আসিল। বলিল,

"কে গো, তুমি? এমন গালি দিচ্ছ কেন?"

গৌরমণি, আবার বিকট মুখভঙ্গি করিল। এবং বিকৃতকণ্ঠে কহিল,

"আমাকে চিন না? আমি তোমার যম!"

এই বলিয়া, গৌরমণি, সেইখান হইতে অতি দ্রুতবেগে বাহির বাড়ীর সিংহদ্বারের নিকট চলিয়া আসিল। দেখিল, দোবেঠাকুর এদিক ওদিক ঘুরিয়া পাহারা দিতেছে। দোবেঠাকুর ঘুরিয়া সম্মুখে আসিল,—গৌরমণিও তাহার প্রতি বিষম বিলোল কটাক্ষ করিয়া চলিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

ভীষণ স্বপ্ন।

রজনী চারিদণ্ডের সময়, ইন্দুমতী নিজহস্তে শয্যা রচনায় প্রবৃত্ত হইল। বাগানের বিবিধ ফুল আনিয়া, বিছানার চারিদিকে ছড়াইয়া দিল। মশারির ঝালরের সহিত, যুঁই ফুলের মালা গাঁথিয়া রাখিল। ফুলের ছড়াছড়ি গড়াগড়ি হইতে লাগিল। ফুলের মনোরম সুগন্ধিতে গৃহ পরিপূরিত হইল। বিছানা করা হইলে পর, ইন্দুমতী, নরেন্দ্রনাথের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু, নরেন্দ্রনাথ আসিতেছে না। তিল তিল করিয়া, যতই রাত্রি বাড়িতে লাগিল, ইন্দুমতীর উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ততই প্রবলতর হইতে আরম্ভ করিল। এই আসে, এই আসে ভাবিয়া, একবার উঠিয়া দাঁড়ায়; আবার বসে, আবার উঠিয়া যাইয়া কপাটের নিকট দাঁড়াইয়া কি দেখিতে থাকে। আসার আশায় অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল, তবুও নরেন্দ্রনাথ আসিল না।

তখন ইন্দুমতী, উন্মাদিনী ব্রজকামিনীর ন্যায় উন্মত্তা হইল। ইন্দুমতী, কবরী উন্মুক্ত করিয়া কুটিল কুন্তলীগুচ্ছ এলোমেলো করিল; এক গোছা নির্মুক্ত কেশ ধরিয়া, শুধু শুধু টানিতে লাগিল; টানিতে টানিতে কতকগুলি চুল ছিঁড়িয়া ফেলিল। অবশেষে অত্যন্ত

ক্লান্ত হইয়া শয়ন করিল। শয়নকালে, আগুল্ফ প্রলম্বিত কেশপাশের কিয়দংশ পৃষ্ঠতলে, কিয়দংশ কপালের উপর, কতকগুলি মুখের উপর নিপতিত হইল। ইন্দুমতী, ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না। অথবা জানিয়াও কোন প্রতিকারের চেষ্টা করিল না। পাগলিনীর ন্যায় শয়ন করিয়াই রহিল। কিয়ৎকাল পর, ইন্দুমতীর অগোচরে তন্দ্রা আসিল। স্বপ্ন দেখিল ঃ—

পশ্চিম আকাশে যেন ঘোর আগুণ লাগিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল প্রভঞ্জনও যেন বিশ্বগ্রাস করিবার নিমিত্ত, সিন্দুর বিনিন্দিত প্রদীপ্ত অনলের অনন্ত শিখার সহিত বিপর্য্যয় ভাবে তুমুল যুদ্ধ করিতেছে। সেই ভীষণ অনল-ধূমে জগতকে এক একবার নিবিড় ঘন তিমিরাচ্ছন্ন অন্ধকার রজনীর ন্যায় আঁধার করিয়া ফেলিতেছে। আবার মাঝে মাঝে প্রচণ্ড অনিল আসিয়া যেন এক ঝাপটে, সেই ভীষণ ধূমরাশিকে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে। যেই ধূমরাশি চারিদিকে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে, অমনি আবার ভয়ঙ্কর অনল, সশিখায় দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সেই অবিরাম প্রখর অনলাস্তর হইতে যেন প্রলয় কালের জলদ প্রক্ষিপ্ত বিদ্যুতধ্বনির ন্যায় অনন্ত গর্জ্জন হইতেছে। সে ধ্বনির বিরাম নাই—অবিরাম অনন্ত ধ্বনি। সেই ভীষণ শব্দে পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, প্রাণীমাত্রেই আতঙ্কে শিহরিতেছে এবং সেই অনলে পড়িয়া, সকলেই যেন মরিতেছে। মরিবার সময় যন্ত্রণায় যেন ছট্ ফট্ করিয়া হস্তপদাদি আলোড়ন বিলোড়ন করিতেছে। ইন্দুমতীও যেন অগ্নিতে পুড়িয়া মরিবে। সেই ভয়ে তাহার শরীর বাতবিক্ষোভিত কদলী পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল।

ইন্দুমতীর ত্রাস অবলোকন করিয়া যেন শ্মশান পিশাচকুল, শূন্য হইতে দন্তপাতি বিস্ফারিত করিয়া, খল্ খল্ হাসিতেছে—বিকট টিট্কারী দিতেছে এবং আনন্দোল্লাসে উন্মত্ত হইয়া, ধেই ধেই নাচিতেছে—হাততালি দিতেছে—বীভৎস মুখভঙ্গি করিতেছে।

অকস্মাৎ একটা জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আসিয়া যেন ইন্দুমতীর কাপড়ে পড়িল। পড়িতেই কাপড় খানা ধপ্ ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ইন্দুমতী তখন সকাতরে করজোড়ে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল। ডাকিল, "হে বিপত্তিভঞ্জন, শ্রীমধুসূদন! আমাকে দগ্ধ করিও না। এখনও আমার দেবসেবা পরিপূর্ণ হয় নাই।" এই কথাগুলি বলিতে না বলিতেই যেন ইন্দুমতীর অর্দ্ধাঙ্গ পুড়িয়া গেল। তথাপি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না। কেবল গভীর ভক্তির সহিত, একাগ্রমনে ভগবানের নিকট বলিতে লাগিল। বলিল, "এইমাত্র দেবতার অর্চ্চনা শিখিতেছি; ঠাকুর, অসময়ে প্রাণ লইও না। যদিও অর্দ্ধাঙ্গ পুড়িয়াছে তথাপি রক্ষা কর; আমি জনমদুঃখিনী!" কিন্তু, ভগবান, ইন্দুমতীর এই হৃদয়স্পর্শী কাতরোক্তি শুনিলেন না। শুনিলে আর সংসারে ভাবনা ছিল কি?

কেবল দেখাইলেন, সেই জ্বলন্ত অগ্নির ভিতরে, এক অপূর্ব্ব পবিত্র রমণীমূর্ত্তি। আলুলায়িত কেশা, গৈরিক বসন পরিধানা, ত্রিশূ ধারিণী রমণীকে দেখিয়া ইন্দুমতীর একটু সাহস জন্মিল।

ও যেন ইন্দুমতীকে অভয় প্রদান করিয়া, সস্নেহে কহিলেন, "মা, তুই ভয় করিস্ না। তোর ঘোর বিপদকাল উপস্থিত। অনেকবার তোমায় পরীক্ষা করিয়াছি; এবার শেষ পরীক্ষা।

এবার অনেক ক্লেশ পাইবি। সে ক্লেশ সহ্য করিয়া, যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিস্; তবে স্বর্গবাস হইবে। তোর আরাধ্য দেবতার পূজা, এ পরীক্ষায় বুঝা যাইবে। সংসার ভীষণ স্থান। এখানে প্রলোভনের রাজত্ব। সেই প্রলোভনে পড়িয়া দেবতার পূজা ভুলিস্ না।" মুহূর্ত্তমধ্যে এই কথাগুলি বলিয়া, রমণী সেই প্রজ্বলিত অনলে মিশিয়া গেলেন। ইন্দুমতী তন্দ্রাবেশেই জিজ্ঞাসা করিল, "মা, অনেকবার পরীক্ষা করিয়াছ, তবুও আবার পরীক্ষা কেন? সেই সমস্ত পরীক্ষায় কিছু বুঝিতে পার নাই কি? এ তোমার কি রীতি, মা?" অনলের ভিতর হইতে আবার উত্তর হইল, "মা, যতবার পরীক্ষা করিয়াছি; ততবারই জিতিয়াছ। এবারকার পরীক্ষা কেবল তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত।"

ইন্দুমতী, রমণীকে ভালরূপ দেখিবার নিমিত্ত, তন্দ্রাবেশে আবার চক্ষু মেলিল। কিন্তু, আর রমণীকে দেখিতে পাইল না। আরও যেন কত কথা জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়াছিল, তাহাও পারিল না। সেই সময় তাহার সমস্ত শরীর যেন অনলে জড়াইয়া ধরিয়াছে। অগ্নির যাতনা সহ্য করিতে পারিল না। ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল। জাগিল। জাগিয়া বিছানায় হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখিল, নরেন্দ্রনাথ নাই। ইন্দুমতীর প্রাণ তখন ভয়ে আরও দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। বুঝিল এ স্বপ্ন; কিন্তু স্বপ্ন জানিতে পারিয়াও চিত্তোদ্বেগ নিবারণ করিতে পারিল না।

ইন্দুমতী, স্বপ্ন দেখিয়া চিৎকার করিবার পূর্ব্বেই নরেন্দ্রনাথ শয়নার্থ ঘরে আসিয়াছিল। কিন্তু একবারে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে

নাই। কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া ইন্দুমতীর শয়ন-সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল। দেখিল, প্রাবৃটকালিন প্রগাঢ় জলদমালার ভিতরে যেন সৌদামিনী হাসিতেছে। অম্বরের তড়িৎ, ক্ষণস্থায়ী। নয়ন ভরিয়া দেখিতে পারা যায় না। তড়িত বিকাশের পরক্ষণেই মেঘ ডাকিয়া বলে, চাহিবে ত মাথা ভাঙ্গিব—প্রাণ নিব! কাজেই সেই ভয়ে কেহ তড়িতের দিকে চায় না। বরং মাথায় হাত দিয়া "জৈমিনি জৈমিনি" করিতে করিতে, লুকাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু ধরাতলে এ স্থিরসৌদামিনী, চঞ্চলতা বিবর্জ্জিতা। বাসনা পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলেও এ চপলা মেঘান্তরালে লুকাইবে না। নরেন্দ্রনাথ অনিমিষ লোচনে, ইন্দুমতীর অনিন্দিত শয়ন-সৌন্দর্য্য বিলোকন করিয়াও দর্শনাভিলাষ পূরাইতে পারিল না। মনে মনে ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, যদি সহস্র চক্ষু পাইতাম; তবে বুঝি এ আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি জন্মিত। আমরা কিন্তু জানি:—

"নিস্বোবাঞ্ছি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো,
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বংপুনঃ।
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতি র্ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি,
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং পুনঃ পুনরহো আশাবধিং কোগতঃ॥ *

আশার নিবৃত্তি নাই।

যাহাহউক, যেই ইন্দুমতী চিৎকার করিয়া উঠিল; অমনি নরেন্দ্রনাথ গৃহে প্রবেশ করিয়া ইন্দুমতীকে জড়াইয়া ধরিল। ইন্দুমতীও

* শান্তিশতকম্, ১ম পরিচ্ছেদ; ২৪ শ্লোক।

নরেন্দ্রনাথকে ভুজলতায় বেড়িয়া ধরিয়া কাঁপিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ, অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল,

"ইন্দু, একি! একি! চিৎকার করিলে কেন?"

ইন্দুমতীর দুঃস্বপ্ন জনিত ভয় এখনও হ্রাস হয় নাই। কাজেই, নরেন্দ্রের কথায়, কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিল না। নরেন্দ্রনাথ, আরও বিস্মিত হইল। বলিল,

"ইন্দু, অমন করিতেছ কেন? কি হয়েছে?"

এই বলিতে বলিতে, নরেন্দ্রনাথ দেখিল যে, ইন্দুমতী মূর্চ্ছিতা—ভূমিতে পড়ে পড়ে। তখন তাড়াতাড়ি, ইন্দুমতীকে ধরিয়া, নিজের ক্রোড়ের উপর রাখিল। মাথায় জলসিঞ্চন করিতে লাগিল; নিকটেই জল ছিল। কিয়ৎকাল পরেই ইন্দুমতীর চৈতন্যোদয় হইল। নরেন্দ্রনাথ পুনরায় ভীত-চিত্তে কহিল,

"ইন্দু, অসুখ করেছে কি?"

ইন্দুমতী, এবার ধীরে ধীরে বলিল, "না।"

নরেন্দ্র। তবে অমন করিতেছ কেন?

ইন্দুমতী তখন নরেন্দ্রনাথের সন্নিধানে আমূল স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বিবৃত করিল। শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ হাসিল। বলিল,

"ছি! তুমিও দেখছি এক পাগল। স্বপ্ন কি কখনও সত্য হয়?"

ইন্দুমতী, নীরব। নরেন্দ্রনাথ তখন ইন্দুমতীর অলীক স্বপ্ন ভয় অপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—০(*)০—

দোবেঠাকুর।

রমণী কটাক্ষ, চুম্বক পাথর। এই চুম্বকের আকর্ষণে, মানুষ মন্ত্রমুগ্ধবৎ আপনি পড়ে—আপনি মরে। সামান্য বায়ু প্রবাহে সাগরে যেমন তরঙ্গ খেলিতে থাকে, মহাপ্রাণীর প্রাণও তেমনি অতি সহজে পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়; হিমাদ্রি টলে; সোণার সংসার ভাসিয়া যায়; মানুষ আত্মপর ভুলিয়া যায়,—লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তাই বলিতেছি, সংসারে এ কুহক কেন?

মহাদেব দোবে, একদিন একবার মাত্র একটী রমণীর বিলোল কটাক্ষ অবলোকন করিয়াছিল। সেই আকর্ষণে, এখন দোবেঠাকুর মাটি হইয়া গিয়াছে; তাহার বিলাস-হৃদয়-প্রসূনে কীট প্রবেশ করিয়াছে; কোন কার্য্যেই এখন আর তেমন মন প্রবেশ করে না; কেবল সেই কটাক্ষ হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছে; অবিরত সেই ভাবনায়, সেই চিন্তায়, হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে, দোবেঠাকুর প্রভুর আদেশ সযত্নে প্রতিপালন করিত; তাহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া, কেহ রায়বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিত না। আর এখন, যে সে রায়বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছে; রায়মহাশয়ের আদেশ উপেক্ষিত হইতেছে। এখন দোবেঠাকুর, সিংহদ্বারে লাল বনাতের জামা প্রভৃতি পরিধান করিয়া, কেবল বসিয়া

মাত্র। ভাল মন্দে আর ভ্রূক্ষেপ নাই—লক্ষ্য নাই।

আজ অন্ধকার রাত্রি। জগৎ ঘন আঁধারে পরিবৃত। কিছুই পরিলক্ষিত হইতেছে না। দোবেঠাকুর, প্রভূত ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া, সেই তিমিরাচ্ছন্ন গভীর রজনীতে, একটী রমণীর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রমণী, দোবেঠাকুরকে দেখিয়াই কটাক্ষ করিল। কাটাঘায়ে লবণের ছিটা দিলে যেমন হয়; এ কটাক্ষে দোবেঠাকুরের প্রাণও তেমনি হইল। দোবেঠাকুর আর সহ্য করিতে পারিল না। অমনি রমণীর পদতলে পড়িয়া প্রেমভিক্ষা মাগিল। বলিল,

"দেখ, সুন্দরী, তুমি বড়ই সুন্দরী। আমি তোমার কাছে হনুমান তুল্য।"

দোবেঠাকুর, হিন্দুস্থানী লোক। কথাগুলি হিন্দিতেই বলিতেছিল। কেবল, পাঠক পাঠিকার সুবোধার্থ আমরা বঙ্গভাষায় বলিব।

রমণীর গাত্রে হাত দিয়া, দোবেঠাকুর যেমন কথাগুলি বলিতে যাইতেছিল; রমণী, অমনি সরিয়া দাঁড়াইল। পরে, বলিল,

"মর, মিন্সে? গায় হাত দিচ্চিস্ কেন?"

আবার কটাক্ষ। এ কটাক্ষে, দোবেঠাকুর আরও পুড়িয়া মরিল। তখন প্রেম-বিহ্বল চিত্তে, অঙ্গ ভঙ্গী সহকারে সুর তুলিয়া গাহিল :—

তুম বিন জিঅব হম কৈসে?
আও আও প্যায়ারী হমারী।
তোরী নজরিয়া জাদুভরী॥
তুম বিন জিঅব হম কৈসে?

এই গানে রমণী খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। দোবেঠাকুর আবার সুর ধরিল,

"তুম বিন জিঅব—"

রমণী, অমনি বাধা দিয়া বলিল,

"চুপ কর, মিন্সে। নৈলে ঝাটা পেটা ক'রব। পোড়ামুখোদের গোল্লায় যাবার আর জায়গা নেই নাকি?"

পুনরায় সহাস্য কটাক্ষ করিল।

দোবেঠাকুর এবার সম্পূর্ণ জ্ঞান হারাইল। রমণীর প্রলোভনপূর্ণ কটাক্ষ ও হাসি দেখিয়া, উল্লাসে মাতিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বলিল,

"চলনা সুন্দরী, চল্না; গোল্লায় যাই! গোল্লা কোন জায়গায়, সুন্দরী?"

এই বলিয়া, রমণীর হাত ধরিয়া টানিয়া নিয়া চলিল। তখন গৌরমণি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল। হাত ঝাড়া দিয়া কহিল,

"কি পোড়ারমুখ, গায় হাত দিয়ে কথা? দাঁড়াও ঝাঁটা দিয়ে কাঁধের ভূত তাড়াচ্ছি!"

গৌরমণি, ঝাঁটা খুঁজিতে লাগিল। প্রকৃতই কি গৌরমণি ঝাঁটা খুঁজিতেছিল? না। গৌরমণি, দোবেঠাকুরকে দিয়া কোনও কার্য্য উদ্ধার করিবার মনস্থ করিয়াছে। বোধ হয়, তন্নিমিত্তই সেইদিন রায়বাড়ী হইতে আসিবার সময়, দোবেঠাকুরের প্রতি বিষম বঙ্কিম কটাক্ষ করিয়াছিল। সেই কটাক্ষের ফল, এতদিনে ফলিতে চলিল। ঝাঁটা অন্বেষণ করা, ছলনা মাত্র।

এদিকে গৌরমণির প্রচণ্ডমূর্ত্তি দেখিয়া, দোবেঠাকুর দূরে সরিয়া

দাঁড়াইয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। মনে মনে একবার ভাবিল, কৈ, আমি যাহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত; সে ত আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। বরং রাগিয়া উঠিয়াছে। আবার ভাবিল, বাঙ্গালী রমণী, হাতধরা প্রথাটা বুঝি, বাঙ্গালীদের বড় নিন্দনীয়! তবে ত বড় অন্যায় হইয়াছে। আমি না বুঝিয়া ভুল করিয়াছি। এখন ক্ষমা প্রার্থনা করি। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া গৌরমণির মনস্তুষ্টির নিমিত্ত আগ্রহের সহিত কহিল,

"আরে সুন্দরী, কেন গোসা কর? আমি ত তোমার নফর। তুমি যাহা করিতে বলিবে, আমি তাই করিব।"

গৌরমণিরও ইহাই অভিলাষ।

তখন গৌরমণি একবারে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। দোবেঠাকুরের প্রতি যথেষ্ট ভালবাসার ভাব দেখাইতে লাগিল। উপর্য্যুপরি তামাক ও পান সাজিয়া আনিয়া দিতে লাগিল; এবং নানা প্রকার হাসি কৌতুকের কথা বলিতে লাগিল। দোবেঠাকুর ত পূর্ব্বেই গলিয়া গিয়াছিল। এখন আরও গলিয়া গেল।

গৌরমণি, সেই অবসরে দোবেঠাকুরের নিকট অতি সংগোপনে একটী কথা বলিল। দোবেঠাকুর শুনিবামাত্র "উঁহো" করিয়া নিষেধ করিল। তাহার প্রাণ দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। গৌরমণি অমনি বলিয়া উঠিল,

"একি! দোবেঠাকুর, এই কি আমার প্রতি তোমার ভালবাসা? এই কি আমার কার্য্য করা?"

গৌরমণি তখন বিষম কুটিল কটাক্ষ করিল।

দোবেঠাকুর আবার মরমে মুরিয়া গেল; কিন্তু নীরব। গৌরমণির কথা শুনিয়া তাহার মাথা ঘুরিতেছিল; চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিতেছিল। কাজেই, সেই কটাক্ষে, গৌরমণির কথার উত্তর দিবার শক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল।

গৌরমণি এবার দোবেঠাকুরের কাণের নিকট মুখ নিয়া চুপি চুপি ভাবি প্রেমের আশা দিল। পরে প্রকাশ্যে বলিল,

"ঠাকুর, তোমার কোন ভয় নাই। এই চিঠিখানা দিবে মাত্র।"

গৌরমণি, একখানা চিঠি বাহির করিল।

আবার কটাক্ষ। কটাক্ষ করিয়াই দোবেঠাকুরকে যেভাবে চিঠিখানা দিতে হইবে, তাহা বেশ করিয়া বলিয়া দিল। নানাপ্রকার বুঝ প্রবোধ দিয়া নির্ভয়তা জন্মাইল। এই চিঠির কথা কোনরূপ প্রকাশ না হয়, তাহার জন্যও বিশেষরূপ বলিল। চিঠিখানা দিতে পারিলেই সে চিরদিনের নিমিত্ত, দোবেঠাকুরের হইবে; ইহাও বলিতে ত্রুটী করিল না।

তখন দোবেঠাকুর চিঠিখানা নিয়া, "রাম, রাম" বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—*—

কর্ত্তব্য নির্ণয়।

প্রতুল ও গৌরমণি মুখামুখি বসিয়া, ইন্দুমতী ও নরেন্দ্রনাথের বিষয় ভাবিতেছিল। কি করিলে, ইন্দুমতী নরেন্দ্রনাথের বিরাগভাজন হইতে পারে, সেই চিন্তায় উভয়ে নিযুক্ত ছিল। গৌরমণির বাসনা পুরিয়াছে। প্রতুল, এখন তাহার প্রণয়ে পরিলিপ্ত হইয়াছে। গৌরমণিও প্রতুলের উপকার করিবার মানসে বিশেষ উৎকণ্ঠিতা। প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়াছে; প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়াছে —করিতেছে—প্রাণ দিয়াও প্রতুলের আদেশ প্রতিপালন করিবে।

গৌরমণি, সেই দিন দোবেঠাকুরকে দিয়া একচাল চালিয়াছে। তাহাতে বড় বেশী সুফল হয় নাই। তাই, মনে মনে হাজার হাজার মন্ত্রণা গড়িতেছে। গড়িয়া গড়িয়া, নিজেই আবার ভাঙ্গিতেছে। প্রকাশ্যে প্রতুলের নিকট কিছুই বলিতেছে না। প্রতুলও দুই একটী উপায় উদ্ভাবন করিতেছে বটে; কিন্তু, গৌরমণির নিকট, সেই সমস্ত উপযুক্ত বলিয়া, বোধ হইতেছে না। পাপ কার্য্যে বাধা বিঘ্ন অনেক। গৌরমণি, কিছুতেই কিছু অবধারণ করিতে পারিতেছে না। তখন তাহার হৃদয়

উদ্‌ভ্রমে বিলোড়িত হইয়া উঠিল। উদ্রিক্ত চিত্তবেগ বিলুপ্ত করিবার নিমিত্ত, নিজে নিজেই পরিহাস আরম্ভ করিল। এবং সহাস্যে প্রতুলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,

"গাছ ভাঙ্গে বায়ুভরে।
মাটি নাহি চাহে ফিরে॥"

প্রতুল, কথা বলিতে বলিতে, অন্য দিকে চাহিয়াছিল। গৌরমণি, কথায় কথায় শ্লোক বলিতে জানিত। প্রতুলকে অন্য দিকে চাহিতে দেখিয়াই উপরোক্ত শ্লোকটি বলিল। প্রতুল, গৌরমণির শ্লোক শুনিয়া, হাসিয়া উঠিল। বলিল,

"বেশ কবি, বেশ। এত রঙ্গ কোথায় শিখিলে?"

গৌরমণি, এবার আর শ্লোক বলিল না। কেবল বলিল,

"তোমাকে পেয়ে শিখেছি!"

প্রতুলও এবার গৌরমণির প্রতি বিদ্যুদ্দাম সদৃশ বিলোল কটাক্ষ করিল। এ অপাঙ্গ দৃষ্টি, গৌরমণির অন্তরের পরলে পরলে প্রবেশ করিল। তাহার আত্মবিভ্রম জন্মিল; স্বর্গে কি মর্ত্তে বুঝিতে পারিল না। পৃথিবী ছাড়িয়া যেন এমন কোন স্থানে গিয়াছে; যেখানে জগতের সুখ দুঃখের, জ্বালা যন্ত্রণার কোন সংশ্রব নাই। সেই রাজ্যে বিষাদ-লহরী খেলিতে পারে না; কেবল অনন্ত সুখ,—অনন্ত শান্তি। গৌরমণি, সেইখান হইতে ফিরিতে চাহিতেছে না। আকাঙ্ক্ষা, আজীবন সেই শান্তি সাগরে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু, নিরবচ্ছিন্ন সুখ, কাহার ভাগ্যে

ঘটে না। এটি প্রাকৃতিক নিয়ম। গৌরমণিকে শীঘ্রই সেই সুখভ্রষ্ট হইতে হইল। তাহার মন তখন প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় প্রেম পিপাসায় প্রলুব্ধ হইল। কিন্তু, মুখ ফুটিয়া প্রতুলের নিকট কিছু ব্যক্ত করিতে পারিল না। কেবল বাণবিদ্ধ জন্তুর ন্যায় যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। বারংবার প্রতুলের দিকে সোৎসুক লোচনে চাহিতে লাগিল। প্রতুল, অতি সহজে, গৌরমণির মনোভাব বুঝিতে পারিল। আপনার অভিপ্রায় গোপন রাখিয়া গৌরমণির আচরণ অবলোকন করিতে লাগিল। কিন্তু, প্রজ্বলিত অনল যেমন কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে পারা যায় না, তেমন গৌরমণির নিকটও প্রতুলের চাতুরী খাটিল না। গৌরমণি, অক্লেশেই প্রতুলের শঠতা বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া প্রেমোচ্ছাসে উদ্বেলিত হইয়া গাহিল,—

সে ত এ হাসি ভালবাসে না;
ভাল দেখে না, ভাল বুঝে না।
তরুণ চাঁদের হাসি, দেখিতে সে অভিলাষী;
(জানি) বাসিফুল কেহ ত চায় না!
পরশিতে আছে নাকি মানা?

প্রতুল, গৌরমণির গাহিবার সময়, একটা ভাঙ্গা ধামা নিয়া, তালে বেতালে বাজাইতেছিল। প্রতুল, বাদ্য করিতে জানে না। তথাপি, গৌরমণির নিকট, সেই ধামার বাদ্যই সুমিষ্ট লাগিতেছিল।

গৌরমণির উদ্দীপ্ত প্রেম-বহ্নি, গানের সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া আসিয়াছিল। গান সমাপ্ত হইল। প্রতুল বলিল,

"গৌর, রাগ করেছ বুঝি?"

গৌরমণি, আহ্লাদের সহিত বলিল,

"কেন?"

প্রতুল। আমার বিশ্রী বাদ্য শুনে?

গৌরমণি। না! তোমার পরিষ্কার হাত; এ হাতের তুলনা হয় না। আমি কেমন গাই?

প্রতুল, কৌতুক করিয়া কহিল,

"ঠিক যেন শ্যামাদের বুধি গাই!"

গৌরমণির প্রতিবাসী—শ্যামাচরণ শিকদার। তাহার একটী বুধি নাম্নী গাভী ছিল। প্রতুল, গৌরমণির কথার পৃষ্ঠে রহস্য করিল। গৌরমণি, প্রতুলের এ বিদ্রূপে রাগিল না। বরং এই কথাগুলিকেই অমৃত তুল্য সুমধুর জ্ঞান করিল এবং খল্ খল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। কিছুকাল পরে, প্রতুল পুনরায় কহিল যে, এখন কি করা কর্ত্তব্য?

গৌরমণি আবার চিন্তাস্রোতে পড়িল। ভাবিল, প্রতুলের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিতে না পারিলে, তাহাকে লইয়া, আজীবন সুখে অতিবাহিত করিতে পারিব না। ভাবিতে ভাবিতে সহসা গৌরমণি হাসিয়া উঠিল।

প্রতুল, গৌরমণিকে হাসিতে দেখিয়া বলিল,

"গৌর, হাসিতেছ কেন?"

গৌরমণি, আনন্দে বিভোর হইয়া কহিল,

"ঠিক করিয়াছি।"

প্রতুল ব্যগ্রতার সহিত বলিল,

"কি ঠিক করিলে গৌর?"

গৌরমণি। এখন সে কথা বলিব না।

প্রতুল, গৌরমণির কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত, বড়ই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল। গৌরমণি, মনে মনে স্থির করিল যে প্রতুলকে দিয়া, একটী প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইবে। কিন্তু, তাহাও করিয়া উঠিতে পারিল না। গৌরমণি ভাবিল, প্রতিজ্ঞা করাইতে যাইয়া, যদি প্রতুলের মন ভাঙ্গিয়া যায়, তবে, সকল সুখে কণ্টক পড়িবে।

এই ভাবিয়া, গৌরমণি প্রতুলের কাণে কাণে মনস্থ উপায়টি বলিল। শুনিয়া প্রতুল বড়ই আনন্দ অনুভব করিল। বুঝিল, এতদিনে অভিলাষ পূর্ণ হইবে। মনে রাখিবেন, সেইদিন রাত্রিতে গৌরমণির বাড়ীতে, এই প্রতুলই আসিয়াছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—০—
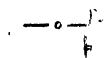
পুনঃ পথিমাঝে।

গৌরমণি, বাড়ীর ঘাটে বসিয়া আছে। দেখিলে বোধ হয়, কাহার নিমিত্ত যেন প্রতীক্ষা করিতেছে। বড় উদ্বিগ্ন চিত্ত। প্রায়ই একটি লোক, গৌরমণির বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে। অদ্য যাতায়াতের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; তথাপিও লোকটি আসিতেছে না। সময় অতীত দেখিয়া, গৌরমণি ভাবিল, লোকটি বুঝি আজ আর আসিবে না। আসিবার হইলে, এতক্ষণ আসিত। আজ না আসুক, দুদিন পরেও ত আসিবে; তখন গৌরমণির হাত ছাড়িয়া পলাইতে পারিবে না। এই ভাবিয়া, গৃহাভিমুখে গমন করিল এবং যাইবার সময় একবার পথের পানে তাকাইল। দেখিল, লোকটি ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছে। গৌরমণির আর বাড়ী যাওয়া হইল না। ফিরিয়া আসিয়া, পথের পার্শ্বে, ভাল ভাবে দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে লোকটি, গৌরমণির সন্নিকটে আসিয়া পড়িল। গৌরমণি, সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল। পরে, অত্যন্ত, সলজ্জ ও বিনীত ভাবে কহিল,

"মহারাজ, আমার একটী কথা।"

নরেন্দ্রনাথ, ঘোড়া থামাইল। কহিল,

"কি কথা? বল।"

গৌরমণি তখন গৌর-চন্দ্রিকা আরম্ভ করিল। বলিল,

"মহারাজ, আমরা ছোট লোক। আমাদের কথা বিশ্বাস নাও করিতে পারেন। কিন্তু, আমি মাটিতে পা দিয়া, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, বলিতে পারি, কদাচ মিথ্যা বলিব না। মিথ্যা বলিলে, আমার মুখে যেন কুষ্ঠ রোগ হয়!"

নরেন্দ্রনাথ, এ সূচনায় বড়ই বিরক্ত হইল। কহিল,

"তোমার অন্য কিছু বলিবার থাকে ত বল। আমার দরকার আছে।"

গৌরমণির মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। ভাবিল, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিব। বলিয়া কি শেষে জীবনটি হারাইব? আর যখন বলিতে বাসনা করিয়াছি, তখন নাই বা বলি কেমনে? এই ভাবিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। গৌরমণির প্রাণ ধড়্ ফড়্ করিতে লাগিল। জিহ্বা শুষ্ক হইয়া আসিল; কথা বাহির হইল না।

নরেন্দ্রনাথ, পুনরায় কহিল,

"কৈ, বলিলে না?"

এই বলিয়া, ঘাড় বাঁকা করিয়া শ্রবণার্থি কর্ণ পাতিয়া দিল।

গৌরমণি আবার ভাবিল, প্রতুলের কার্য্য না করিলেই নয়। প্রাণ যায় সেও ভাল; তথাপি তাহার কার্য্য করিব। তাই চোখমুখ বুজিয়া, উপর্য্যুপরি কয়েকটি ঢোক গিলিয়া, চুপি চুপি নরেন্দ্রনাথের নিকট, কি জানি কি বলিল।

বলিবামাত্র, নরেন্দ্রনাথ, গৌরমণিকে সপা সপ্ করিয়া, কয়েকটি চাবুকের ঘা মারিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটীকেও সজোরে কশাঘাত করিল। ঘোড়াটি কয়েকটি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বায়ুবেগে দৌড়িল। গৌরমণি, "উঃ গেলুম মে—বাবা রে" বলিয়া, চিৎকার করিতে করিতে বাড়ীতে চলিয়া গেল এবং ঘরের ভিতর যাইয়া অর্গল দিয়া বসিল। বসিয়া বসিয়া, বারংবার আহত স্থান মার্জ্জনা করিতে লাগিল। গৌরমণির মনে তখন উদয় হইল, এ রোগের আর ঔষধ নাই! ব্রহ্মার ভাই স্বয়ং বিষ্ণু আসিলেও কিছু করিতে পারিবে না। আমি ত ছার গৌরমণি!! এখন প্রাণটি নিয়া পালাতে পারিলেই বাঁচি। পালাইবার সময়, প্রতুলের সঙ্গে একবার দেখা করিয়া যাইব। প্রতুল কি আমার হাত ছাড়া হইবে? কি জানি? কাহার মনে কি আছে, কে বলিতে পারে?

নরেন্দ্রনাথ কিছুদূর আসিলে পর, গৌরমণির কথা সম্বন্ধে তাহার মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। একবার ভাবিল, নাপিতানী এমন কথা বলিল কেন? মিথ্যাকথা বলিলে যে, তাহার জীবনান্ত হইবে, সে কি তা জানে না? নাপিতানী কখনও ত আমার সহিত কথা কহে না। নিরর্থক মূলবিহীন কথা উঠিতে পারে না। অবশ্য ইহার ভিতর কিছু না কিছু নিগূঢ় অভিসন্ধি লুক্কায়িত রহিয়াছে। প্রতুলের নামে বিপদ ডাকিয়া আনায়, নাপিতানীর লাভ কি? আবার ভাবিল, বৃক্ষে পোকা ধরিলেই লোকে টের পায়। সামান্য বংশের, না কোন

বংশের একটা মেয়ে বিবাহ করিয়াছি ; দুশ্চরিত্রা হইলেও হইতে পারে। নিকৃষ্টবংশের অধিকাংশ মেয়ে ছেলেই ভ্রষ্টা হইয়া থাকে ! তবে কি ইন্দুমতীও হীনবংশ সম্ভূতা ? ছি ! সামান্য গৌরমণির কর্ণেও যখন কথাটা আসিয়াছে ; তখন নিশ্চয়ই ঘটনাটি প্রকৃত। ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।

হঠাৎ নরেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইল ; কি যেন তাহার মনে পড়িল। সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। আবার ভাবিল, সেদিনও বৈঠকখানায়, এ সম্বন্ধে, একখানা চিঠি পাইয়াছি। কে যে চিঠিখানা দিয়া গেল, এ পর্য্যন্ত কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। তাহাতেও ইন্দুমতী সম্বন্ধে কত নিন্দা, কত কুৎসার কথাই লেখা ছিল। আমি তাহা বাতুলের প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছি। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, তাহা বাতুলের প্রলাপ নহে ; সত্য ঘটনা ! ভাল, ইন্দুমতী যদি সত্যই খারাপ হইবে, তবে আমি কি কিছু বুঝিতে পারিতাম না ? সে পূর্ব্বেও যেমন ভালবাসিত এখনও তেমনি ভালবাসিতেছে। যে আমাকে একদণ্ড না দেখিলে, কেমন হইয়া যায়, তাহার প্রাণে যে কিছু দুরভিসন্ধি আছে, এমন ত বুঝিতে পারি না। ইন্দুমতীর মুখ দেখিলে স্বর্গের পবিত্র জিনিস বলিয়া জ্ঞান হয়। হায় ! সেই নির্ম্মল পবিত্র জিনিস কলুষিত হইয়াছে ? আমি বিশ্বাস করিব কেমনে ?

পাঠক ! নরেন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে যে চিঠির কথা বলিল, সেই পত্র, দোবেঠাকুর, নরেন্দ্রনাথের অলক্ষিতে বৈঠকখানায় রাখিয়াছে। গৌরমণির প্রলোভন-পরিপূর্ণ প্রেমের খাতিরেই দোবেঠাকুরের এই

গর্হিত কার্য্য। ঘরের ইন্দুরে যে বাঁধ কাটিয়াছে, নরেন্দ্রনাথ, তাহা বুঝিবে কি প্রকারে?

সহসা অক্বার নরেন্দ্রনাথের মনে প্রতুলের পিতার সহিত বিরোধের কথা উদয় হইল। আরও সন্দেহ বদ্ধমূল হইল—প্রতুল দুশ্চরিত্র বলিয়া। নরেন্দ্র, প্রতুলের স্বভাব চরিত্রের বিষয় জানিত। কাজেই অসৎ উপায়ে ইন্দুমতীকে কলঙ্কিত করা অসম্ভব নহে। নরেন্দ্রনাথের মনে নানা প্রকার সন্দেহের উদ্রেক হইল। ঘোড়া হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া নামিল এবং ঘোড়া রাখিয়া পদব্রজে গৌরমণির গৃহাভিমুখে চলিল। সহিস্ কিছু দূরে ছিল। সে দেখিল, নরেন্দ্রনাথ যেন ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল। তাই, সে তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘোড়া ধরিল। পরে, ঘোড়া লইয়া নরেন্দ্রনাথের নিকটে আসিল। নরেন্দ্রনাথ সহিসকেও দুই ঘা চাবুক মারিল। সক্রোধে বলিল,

"ঘরমে লে যাও, শূয়র।"

সহিস তখন ঘোড়া লইয়া বাড়ী অভিমুখে ছুটিল। পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল, বাবুর মেজাজ আজ এত খারাপ হ'ল কেন? বাবু ত কখনও চাকর টাকরের প্রতি নিদয় ছিলেন না। না জানি ঐ মাগিই কি করিয়াছে। এই ত পথে আসিতে আসিতে বাবু কত দেলখোস্ মজাদারী কথা বলিতেছিলেন। নাপিতানীর কাছে আসিয়াই ত কি হইল। সহিসের রাগ তখন গৌরমণির উপর পড়িল। ঠিক করিল, সে তাহার ঘর পোড়াইয়া দিবে। তখন সে ঘোড়া লইয়া বাড়ী আসিল। সেদিন ঘোড়ার ভাগ্যে আহার কিছু কম পড়িল।

নরেন্দ্রনাথ, গৌরমণির বাড়ীর নিকটে আসিল। আসিয়া ডাকিল, "গৌরমণি, গৌরমণি ও নাপিতানী!" গৌরমণি নরেন্দ্রনাথের ডাক শ্রবণ করিয়া, ভীতচিত্তে গৃহের ভিতরস্থ নিভৃতস্থানে লুকাইল এবং ভাবিল যে, বুঝি তাহাকে ধরিতে আসিয়াছে। এবার ধরিতে পারিলে, চাবুকের বাড়ী ত ভালই; প্রাণটি লইয়া টানাটানি হইবে। কিন্তু গৌরমণিকে বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না; নরেন্দ্রনাথ গৌরমণির গৃহের কপাটের অতি নিকটে আসিল। বলিল,

"গৌরমণি! আমি অপরাধ করিয়াছি। দয়া করিয়া আমার একটী কথা শুনে যাও।"

গৌরমণি নিভৃতস্থানে থাকিয়াই নরেন্দ্রনাথের সমস্ত কথা শুনিতে পাইয়াছিল। তখন অনন্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ভাবিল, ঔষধ ধরিয়াছে। রোগী সহজে কি তিক্ত ঔষধ খাইতে চাহে? জোর করিয়া খাওয়াইয়া দিতে হয়। ঔষধ পেটে গেলে ত অনন্ত ফল! গৌরমণি, ছল করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরের বাহির হইল। গৌরমণি, ঘরের বাহির হওয়ামাত্র, নরেন্দ্রনাথ অতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল,

"তুই এসব জানিলি কি প্রকারে?"

গৌরমণি, কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল,

"মহারাজ, আপনারা বড়লোক—"

নরেন্দ্রনাথ, গৌরমণির কথায় বাধা দিয়া, সক্রোধে বলিল,

"দেখ্ মাগী, তোর মহারাজ রেখে দে এখন। শীগ্‌গির যথার্থ কথা বল। তোর ভয় নেই।"

গৌরমণি, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল,

"সে সব কথা বলিতে লজ্জা করে।"

এই বলিয়া, কাপড়ের কিয়দংশ মুখের ভিতর গুঁজিয়া দিল। এবং মাথা নিচু করিয়া রহিল। নরেন্দ্রনাথ তখন আরও ব্যগ্রতার সহিত কহিল,

"বল মাগী, নৈলে তোর মাথা ভাঙ্গিব।"

নরেন্দ্রনাথ, গৌরমণিকে মুষ্টি দেখাইল। এবং মনে মনে ভাবিল, গৌরমণিও বলিতে লজ্জা বোধ করে। যে গৌরমণিকে সকলে ঘৃণা করিয়া থাকে ; সেই গৌরমণিও আমাকে আজ পরিহাস করিতেছে। ছি! হয় এ প্রাণ পরিত্যাগ করিব, না হয়, ইন্দুমতীকে জনমের মত পরিত্যাগ করিয়া এই জঘন্য লোকাপবাদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব।

গৌরমণি তখন সুযোগ পাইয়াও, ভয়ে ভয়ে, তাহার কুটিল উদরে যত বিষ ছিল, ক্রমে ক্রমে সমস্তই নরেন্দ্রনাথের শ্রবণ বিবরে ঢালিয়া দিল। শেষ আরও বলিল যে রামভদ্রের দ্বারাই এই বীভৎস ঘটনা ঘটিয়াছে। বিবাহের বহু পূর্ব্ব হইতে প্রতুলের সঙ্গে ইন্দুমতীর ভালবাসা জন্মিয়াছে। এই সকল কথা, গৌরমণি এমন সুন্দর ও সরলভাবে সাজাইয়া বলিল যে, নরেন্দ্রনাথ গৌরমণির শঠতা কিছুই বুঝিতে পারিল না। বরং গৌরমণির এক একটা কথা অতীব অভিনিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিল। শ্রবণ করিতে করিতে কখন ক্রোধে স্ফুরিতাধর হইয়া দন্তে দন্তে পেষণ করিতে লাগিল আবার কখনও গভীর বিষাদে নরেন্দ্রনাথের সুন্দর মুখকমল অতিশয় মলিন হইতে লাগিল ; কখনওবা ঘৃণা ও লজ্জায় সম

শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল। গৌরমণিও বলিতে বলিতে নরেন্দ্রনাথের এ সকল অবস্থা দেখিতেছিল। তখন আরও বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত, নরেন্দ্রনাথের সেই সকল উত্তেজনার ভাব দেখিয়া, দৃঢ়তার সহিত নরেন্দ্রকে অনুরোধ করিল যে, সে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও দিতে পারে।

নরেন্দ্রনাথ, গৌরমণির অকুতোভয়তা অবলোকন করিয়া, উদ্‌ভ্রান্ত মানসে ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, ছি! আমি সেই জঘন্য দৃশ্য দেখিব? তা হইবে না। ইন্দুমতী আমার অন্তরের সর্ব্বস্ব। আমার আঁধার ঘরের আলো; সুখে শান্তি,—শোকে অশ্রু—প্রীতির প্রসূন; প্রেমের পঙ্কজ; আমার সোহাগের যাহা কিছু, সকলি সে আমার। যাহার পদ্মাভানন, ইহজগতে স্বর্গের সম্পত্তি, যাহার স্পর্শ সুখে, শরীর বিবশ বিকল হয়; যাহার কথা প্রসঙ্গ কর্ণকুহরে সুধা ঢালিয়া দেয়; যে আমার আমি যাহার বলিয়া, এজীবন, এ সংসারে উৎসর্গ করিয়াছি; হায়! কেমন করিয়া, তাহার বীভৎস দৃশ্য নিরীক্ষণ করিব? কে জানে, পবিত্র অমৃতাশনে, গরল ভক্ষণ জনিত ফল উপভোগ করিতে হয়? কে জানে, কোকিলকণ্ঠে বিষ; ফুলে তরবারি; তুষারে কলঙ্ক—পঙ্কজে কণ্টক! যদি থাকে—থাক্। জগতের এ নিয়ম মানিব না; পিশাচের এ অভিধান! কিন্তু সকলি সম্ভব—অসম্ভব!! তবুও অসম্ভব!!!

এ সকল ভাবিয়া, নরেন্দ্রনাথ ঠিক করিল—আর গৌরমণির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিবে না। কিন্তু, আবার কি জানি কি মনে হইল। ভাবিল, কলঙ্কপূর্ণ চন্দ্র কে না দেখে? কণ্টকিত মৃণাল

ছানিয়া, কে না মৃণালিনী তুলে? দেখিতে দোষ কি? দেখিব, কিন্তু এ প্রাণ থাকিতে আর স্পর্শ করিব না—পরিত্যাগ করিব, লোকাপবাদ হইতে বিমুক্ত হইব। তাহাই ত দর্শনজনিত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইবে? পরে, প্রকাশ্যে ব্যাকুলভাবে বলিল,

"গৌর, তোর পায়ে পড়ি, সত্য, বল, আমার প্রাণের ইন্দু কলঙ্কিনী হইয়াছে না কি? মিথ্যা বলিয়া আমার মাথায় বজ্রাঘাত করিস্ না। ইন্দু ভিন্ন এসংসারে আমার সুখ কি?"

নরেন্দ্রনাথ গৌরমণির পায় ধরিবার প্রয়াস করিল এবং তাহার নয়নাশ্রু টস্ টস্ করিয়া পড়িতে লাগিল। গৌরমণি, ছি! ছি! করিয়া সরিয়া পড়িল। নরেন্দ্রনাথ আর পা ধরিতে পারিল না। কিন্তু, গৌরমণি দূরে সরিয়া মনে মনে কত হাসি হাসিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। পরে চাবুকের ঝাল তুলিবে ভাবিয়া বলিল,

"বাবু, আমরা গরীব লোক। আমাদের কথা বাসি হ'লে কার্য্যে লাগে।"

নরেন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। বলিল,

"নাপিতানী, তোর কথাতেই বিশ্বাস। আবারও বলি, বিনা দোষে আমার মাথায় বজ্রাঘাত করিস্ না।"

গৌরমণি, আশ্চর্য্যভাবে কহিল,

"সে কি কথা? মুনিবের সঙ্গে অসত্য ব্যবহার; ধর্ম্ম কি নেই? কাল অনুগ্রহ পূর্ব্বক আসিবেন, আমার কথা সত্য কি মিথ্যা সকলি জানিতে পারিবেন।"

নরেন্দ্র। কখন আসিব?

গৌর। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে।

নরেন্দ্র। ভাল, তাই হবে।

নরেন্দ্রনাথ তখন ভগ্ন-হৃদয়ে শিথিল পাদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—⋯(:)⋯—

প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

গৌরমণির আনন্দ আর গায়ে ধরে না; গা বাহিয়া যেন হর্ষ ফাটিয়া পড়িতেছে। বুঝিল, এতদিনে তাহার সকল উদ্বেগের শান্তি ও উপশম হইবে।

গৌরমণি ভাবিল, আমি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারি? সাগর ছেঁচে রতন তুলিতে পারি; কণ্টক ছানিয়া মৃণালিনী আনিতে পারি। তবে না পারি কি? আমার ক্ষমতা কত! এত ক্ষমতা একজন উকীল ব্যারিষ্টারেরও নাই। ক্ষমতা না থাকিলে কি, আজ বড় ঘরের জমিদার পুত্র গৌরমণির পায়ের কাছে কাঁদে? গৌরমণি কি এ কান্না নিবারণ করিতে পারে না? ইচ্ছা করিলে পাষাণের বুকেও স্নিগ্ধ জল বাহির করিতে পারি; এ কান্নাতে হাসি ফুটাইতে পারি। তা করিব কেন? কে ইচ্ছা করিয়া আপনার পায়ে আপনি কণ্টক ফুটাইয়া অচল হইয়া থাকিতে চায়? সকলেই নিজের সুখের নিমিত্ত পাগল; তবে আমি যে পাগল হইব না, তা তোমাকে কে বলিল? নিজের সুখের পথে কাঁটা দিয়া, কে অন্যের উপকার করিয়া থাকে? যে নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা চায় না, সে ত জগৎছাড়া লোক।

পরোপকার করিয়া সে না হয় চিনির বোঝা বহিবে, আর আমি না হয় নিজের সুখভোগ করিয়া চিটে গুড় টানিব। কিন্তু, এটি জানিও দুজনেই সমান। গাধাও চিনির মর্ম্ম বুঝিবে না, আর আমি ত আমিই! ইহার জন্য ভাবনা কম। ভাল জিজ্ঞাসা করি, এটা কি খারাপ কাজ? পোড়ারমুখগুলি হয় ত বলিবে খারাপ বৈ কি? বলি, তাহারা কি চোখ খেয়ে বসে আছে যে, আপনার স্বভাব দেখে না—বুঝেও না। জান ত লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি। যাহার যেমন রুচি, সে সেই প্রকার চলা ফিরা করিয়া থাকে। এতে দোষ কি? যে ভিন্ন ভিন্ন রুচি দেখিতে পারে না, তাহার চোখ কাণ বুজিয়া থাকাই উচিত।

এই প্রকার গৌরমণি ভাবিতেছে, এমন সময় নরেন্দ্রনাথ আসিয়া, গৌরমণির বাটিতে উপনীত হইল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। সেই সময় গৌরমণি গৃহের মেঝ ঝাড়িতেছিল। গৌরমণি, গৃহঝাড়া স্থগিত রাখিয়া, নরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া, তাহাদের খিড়কীর বাগানের অভিমুখে গমন করিল। ক্রমে ক্রমে উভয়ে বাগানের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৌরমণি তখন নরেন্দ্রনাথকে, প্রাচীরের ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়া, বাগানের ভিতর চাহিয়া থাকিতে বলিল। খিড়কীর বাগান, ইষ্টক নির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রাচীরের গায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ আছে। নরেন্দ্রনাথ, গৌরমণির কথানুসারে, উৎসুকচিত্তে প্রাচীরস্থ ছিদ্র-পথে চাহিয়া রহিল। কিয়ৎকাল পরে দেখিল, একটা লোক

লতাকুঞ্জের ভিতর প্রবেশ করিল। অল্পক্ষণ পরেই, সেইখান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া একটি ফুলের লতার সহিত, একখানা চিঠি বাঁধিয়া রাখিল। খিড়কীর বাগানে, একটি লতাকুঞ্জ ছিল। নরেন্দ্রনাথ কর্তৃক এই লতাকুঞ্জটী অনেক যত্নে প্রস্তুত হইয়াছে। লোকটি, তাড়াতাড়ি পত্র বাঁধিয়াই বাগানের বাহির হইয়া গেল। নরেন্দ্র লোকটিকে চিনিল।

দৈবাধীন, ইন্দুমতীও ঠিক সেই সময়েই কিঞ্চিৎ তফাতে, অন্যদিকে চাহিয়া, বাগানের ভিতর ফুল তুলিতেছিল। এ সকল নরেন্দ্রনাথ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিল। দেখিয়া, নরেন্দ্রনাথের শরীর ক্রোধে বায়ুবিতাড়িত কদলী বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। লোকটি যে তাহার সম্মুখ দিয়া পলায়ন করিল, তথাপি একবার ফিরিয়াও চাহিল না। কেবল ধীরে ধীরে, ইন্দুমতীর অগোচরে বাগানের ভিতর প্রবেশ করিল এবং লোকটির আবদ্ধ কাগজ খণ্ড খুলিয়া আনিল। ইন্দুমতী, এসমস্ত কিছুই জানিতে পারিল না। নরেন্দ্রনাথ, কাগজখণ্ড লইয়া, বাগানের বাহিরে আসিয়া পড়িল। পরে, চিঠিখানা পড়িল:—

"ইন্দু,

পরস্পর শুনিতে পাইলাম, আমাদের গুপ্ত প্রণয় ঘটিত কথা, এতদিনে তোমার স্বামী জানিতে পারিয়াছে এবং প্রতিহিংসা লওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। তাই, আমাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্য মনস্থ করিয়াছি, কিছুদিন তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব না। পারি যদি তবে পত্র দ্বারাই মনোভাব জানাইব। এখন আসি।"

তোমারি প্রণয় পীযূষপিপাসু

প্রতুল।

পত্র পড়িয়া, নরেন্দ্রনাথের ক্রোধ আরও বাড়িল।

মধ্যাহ্ন সময়ে, গৌরমণি প্রতুলকে রায়েদের খিড়কীর বাগানে রাখিয়া গিয়াছিল। কি ভাবে রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। কারণ, সেই সময় সকলেই খাওয়া দাওয়ায় বিব্রত ছিল। কাজেই, কেহই প্রতুলের প্রবেশ জানিতে পারে নাই। সন্ধ্যার সময়, ইন্দুমতী বাগানে বেড়াইতে আসিয়াছিল। প্রত্যহই ইন্দুমতী সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাগানে পরিভ্রমণ করিতে আসিয়া থাকে। আজিও আসিয়াছে। ভ্রমণ করিতে করিতে দুই চারিটি ফুল তুলিতেছিল এবং এক একটী ফুলগাছের নিকট বসিয়া বসিয়া, ফুল গাছের মুলজাত তৃণাদি তুলিয়া ফেলিতেছিল। কাজেই, ইন্দুমতী, প্রতুল কি করিল না করিল, তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না।

নরেন্দ্রনাথ, কিন্তু প্রতুলের পত্র পড়িয়া এবং প্রতুলকে লতাকুঞ্জ প্রভৃতিতে যাইতে দেখিয়া, বিষম সন্দেহ করিল। মনে মনে ঠিক করিল—গৌরমণি যথার্থ কথাই বলিয়াছে। ঘৃণায় অপমানে মর্ম্মাহত হইয়া, নরেন্দ্রনাথ, পত্রখণ্ড হাতে করিয়া সক্রোধে চলিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

—:~:—
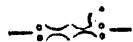
শয়নকক্ষে।

নরেন্দ্রনাথ, খিড়কীর বাগান হইতে একবারে শয়ন কক্ষে আসিল। আসিয়াই ইন্দুমতীকে দেখিতে পাইল। ইন্দুমতীও তখন বাগানের ফুল লইয়া আসিয়াছে মাত্র। নরেন্দ্রনাথ ইন্দুমতীকে দেখিয়াই ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। ইহার মুহুর্ত্তপূর্ব্বে, যে ইন্দুমতীকে অবলোকন করিলে, নরেন্দ্রের শরীরে প্রেমের তাড়িত ছুটিত, হৃদয়ে সুখের সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, এখন সেই ইন্দুমতীকে বিলোকন করিয়া, ঘৃণায় ভ্রূকুঞ্চিত করিল। নরেন্দ্রনাথ এখন ঘোর উন্মত্ত! ভাল মন্দ, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য!

ইন্দুমতীকে দেখিয়া, কি যেন বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু, আবেগের আতিশয্যে—ঘৃণার প্রভূত তাড়নায়, কথাগুলি কোন মতেই ওষ্ঠের যবনিকা ভেদ করিতে পারিল না। কেবল রক্ত অক্ষি গোলক ঘুরিতে লাগিল; চক্ষু কপালে উঠিল; মুখে যেন মরণের ছায়া পতিত হইল। অপাপবিদ্ধা ইন্দুমতী তখন নরেন্দ্রনাথের মুখপানে চাহিয়া রহিল—অনিমিষলোচনে চাহিয়া রহিল। দেখিল, এ মুখ যেন সেই মুখ নহে;—চাঁদমুখ যেন

মেঘে ঢাকিয়াছে। ইন্দুমতী, সেই বজ্রবিদ্যুৎগর্ভ মেঘখণ্ডের মত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বেশীক্ষণ আর চাহিতে পারিল না!

যদি সেই মুহূর্ত্তে ইন্দুমতীর মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িত, অথবা, প্রাণ বিয়োগ হইত, তাহাতে যত ক্লেশ না জন্মিত, নরেন্দ্রনাথের এ মূর্ত্তি দেখিয়া, ইন্দুমতীর ততোধিক কষ্ট হইতে লাগিল। ভাবিল, সে যেন আর এ জগতে নাই—এ জগত যেন আর তাহার নয়; আজ সে ভিখারিণী। জগতে সে একা—একটু দাঁড়াইবার জায়গা নাই; যেখানে দাঁড়ায়, সেইখানেই কত কি স্বপ্ন দেখে—স্মৃতির শ্মশান দেখিয়া, শিহরিয়া উঠে। এ শ্মশান ভুমিতে সে একা—চারিদিকে কঙ্কালের রাশি; কে তাহাকে এ মহাশ্মশান হইতে, শীতল কুটীরে লইয়া যাইবে—নরেন্দ্রনাথ? ইন্দুমতী, আবার নরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিল। দেখিল, এখনও নরেন্দ্রনাথের চোখে আগুণ জ্বলিতেছে—ধক্ ধক্ ধক্! ইন্দুর কুটীর পুড়িয়া গেল! ইন্দু, কাঁদিল,—ইন্দুমতী আজ ভিখারিণী!!!

ভিখারিণী, আশ্রয়ের জন্য, নরেন্দ্রনাথের মুখপানে ঘন ঘন চাহিতে লাগিল। ঐ মুখই তাহার চিরশান্তি নিকেতন—আশা ভরসার মঞ্চ। আর কোথায় যাইবে? যাইবার স্থান থাকিলে ত? তাই আবার চাহিল—কত কি ভাবিল—কথা ত ফুটিল না; বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এবার ইন্দুমতী যেন প্রলয়ের জলে ভাসিতে লাগিল; তাহার বড় সাধের তরী যেন ডুবিয়া

গেল; তরঙ্গে তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে হইতে যেন কোথায় ভাসিয়া চলিল; ভীষণ আবর্ত্ত—আর রক্ষা নাই! ইন্দুমতী চমকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ডাকিল,—

"পরমেশ্বর!—প্রাণেশ্বর!!"

ডাকিয়াই মুর্চ্ছিত হইয়া, নরেন্দ্রনাথের পদতলে পড়িয়া গেল।

নরেন্দ্রনাথ সক্রোধে সোণার প্রতিমাকে সজোরে পদাঘাত করিল। ইন্দুমতী, বাত্যা বিতাড়িত ব্রততীর মত, ধূলায় গড়া গড়ি যাইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ, এ দৃশ্য আর দেখিতে পারিল না। চোখ দুটি বাষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং অনিমিষলোচনে ধূলিবিলুণ্ঠিত মুখকমলখানি দেখিতে লাগিল। দেখিল, সেই শুভ্র ললাট; সেই সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল; সেই কুঞ্চিতকৃষ্ণকেশপাশ; সেই বাসন্তি গোলাপ তুল্য প্রফুল্ল গণ্ডস্থল। আরও দেখিল, সেই সরলতা, সেই মাধুর্য্য, সেই স্নেহ, সেই করুণা; সকলি যেন মুখমণ্ডলে জাগিয়া রহিয়াছে; আর সেই ওষ্ঠাধরে, এখনও ব্রীড়া মাখা প্রেমটুকু লাগিয়া আছে।

নরেন্দ্রনাথ পাগলের মত, সেই ওষ্ঠাধর চুম্বন করিল এবং ইন্দুমতীকে আবার ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। পরে, কত কি প্রলাপ বকিতে লাগিল। ইন্দু, তুই আমার কত আদরের, কত স্নেহের, আমার সোহাগের সার, ভালবাসার ভিত্তি; প্রেমের প্রসূন—আ! প্রসূনে কীট? এও কি সত্য? আমার কুঞ্জের কোকিল, আমার পিঞ্জরার কোকিল—কোকিল! কলঙ্কের কোকিল! কাল কোকিল! কেন পিঞ্জরায় পূরিলাম? কেন

পুষিলাম? কেন মজিলাম? আর না! এ মূর্ত্তি কেন এতদিন দেখি নাই?

এই ভাবিতে ভাবিতে, প্রতুলের চিঠির কথা, বৃশ্চিক দংশনের মত নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। পরে, উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া কহিল,

"পিশাচী, রাক্ষসী, বিশ্বাসঘাতিনী—যাও। আর এ গৃহ কলুষিত করিও না।"

এই বলিয়া, নরেন্দ্রনাথ, ক্রোড় হইতে ইন্দুমতীকে ভূমিতে ফেলিয়া দিল এবং প্রতুলের চিঠিখানা, ইন্দুমতীর গাত্রে ছুড়িয়া মারিল। পত্রখানি ছুড়িয়া মারিয়াই, নরেন্দ্রনাথ, সবেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

গৃহ পরিত্যাগ।

ইন্দুমতীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। দেখিল, নরেন্দ্রনাথ, শয়নকক্ষে নাই। শুধু একখানা পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। ইন্দুমতী, সেখানা নরেন্দ্রনাথের পত্র ভাবিয়া কুড়াইয়া লইল। পড়িল। পড়িয়া জানিল, পত্রখণ্ড নরেন্দ্রের নহে। অমনি ঘৃণায় দূরে নিক্ষেপ করিল। তখন নরেন্দ্রনাথের কঠোর রাগের কারণ বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া ইন্দুর কি হইল? আর কি হইবে? বুক ফাটিয়া, দুইখণ্ড হইয়া যাইতে লাগিল; সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল; ইন্দুমতীর আয়তবিস্ফারিতলোচনযুগল বর্ষাবারিনিষিক্তকুসুম কোরকের ন্যায় অশ্রুপূর্ণ হইল।

তখন ইন্দুমতী ভাবিল, তিনি আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছেন—কলঙ্কিনী ভাবিয়াছেন! এ অবস্থায়, আর এ মুখ দেখাব কি প্রকারে? দেবতার প্রাণে কষ্ট ও যাতনা দিতে, আমার জন্ম হয় নাই। আমি থাকিলে, তাঁহার পবিত্র বংশ, পবিত্র নাম ও পবিত্র গৃহ কলুষিত হইবে। লোক লজ্জা ভয়ে বা ঘৃণায়, আমাকে স্পর্শও করিবেন না। যদি দেবতার পাদপদ্মই পূজা করিতে না পারিলাম; তবে আর এ প্রাণ রাখিয়া লাভ কি?

বরং এ প্রাণ পরিত্যাগ করিব। জগতের কাহাকেও আর এ মুখ দেখাইব না। যে মুখ দেখিয়া, স্বামীর প্রাণে কষ্ট হয়, সেই মুখ কি দেখাইতে আছে ? কিন্তু, দুঃখ এই—তিনি আমাকে বিনা অপরাধে, বিনা দোষে পরিত্যাগ করিলেন; অবিশ্বাসিনী, রাক্ষসী বলিয়া পায়ে ঠেলিলেন। বোধ হয়, ইন্দুমতী, নরেন্দ্রনাথের শেষ কথাগুলি শুনিয়াছিল।

এই ভাবিতে ভাবিতে, ইন্দুমতীর নয়নে প্রবল বারিধারা, গঙ্গাস্রোতের ন্যায় বহিতে লাগিল। আবার ভাবিল, আমি সকল দুঃখ, সকল যাতনা সহিতে পারিব; কিন্তু, মিথ্যা দোষারোপ জনিত দুঃখ সহিতে পারিব না। হায়! এ হতভাগিনীর কেন মৃত্যু হয় না? মরিতে পারিলে, সকল যন্ত্রণার হাত হইতে বিমুক্ত হইতে পারিতাম। আমার পোড়াকপাল! কাহার এত জোর কপাল, এমন স্বামী রত্ন পাইবে? সুতপস্যায়, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে পাইয়াছিলাম; ভাগ্য দোষে, সে সুখের পথে কণ্টক পড়িল। আমি ভিখারিণী; আমার কেন রাজরাণী তুল্য ভাগ্য হইবে? এ দুঃখ হইতে আমার মরণ ভাল।

অনেকেই কষ্টে পড়িয়া, মরিতে অভিলাষ করে বটে; কিন্তু, মরে কয় জনে? বস্তুত, ইন্দুমতী এখন মরিতে পারিলে নিশ্চয়ই মরিত। ইন্দুমতীর চিত্ত, এখন স্থির গম্ভীর, নির্ব্বিকার; নাই কান্না, নাই হাসি; নাই হর্ষ, নাই বিষাদ; কেমন যেন জড়বৎ হইয়া গিয়াছে। ইন্দুমতী তখন আপন মনে গদ গদ ভাবে,

নরেন্দ্রকে উল্লেখ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল। কহিল,

"নাথ, তুমি আমাকে বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতেছ; ভালই। তোমাকে দুঃখ কষ্ট দিতে, এখানে আর থাকিব না। কিন্তু, এই বিনীত আকাঙ্ক্ষা—ইহজন্মে হউক, পরজন্মে হউক, অথবা শত সহস্র জন্মান্তরেও যদি এ পাপ বিমুক্ত হয়, তবে, দয়া করিয়া, পুনরায় এ দাসীকে গ্রহণ করিও। মনে বড় আশা ছিল, যাবার সময় তোমার মুখে হাসি দেখে ও একটী কথা শুনে যাব; কিন্তু কর্ম্ম দোষে, তাতেও বঞ্চিত হইলাম, এই দুঃখ রহিল।"

এই বলিয়া ইন্দুমতী, দেহের সমস্ত বহুমূল্য বসন ভূষণ একে একে খুলিয়া ফেলিল। মাত্র দুগাছি শাঁখা ও লোহা হাতে রহিল। উৎকৃষ্ট পরিধেয় বসনের পরিবর্ত্তে একখানি জীর্ণ ও অপরিষ্কৃত কাপড় পরিধান করিল। তারপর, নরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে সভক্তি প্রণিপাত করিল। আর মনে মনে বলিল,

"জনমে জনমে, জীবনে মরণে,
প্রাণনাথ মম হইও হে তুমি।"

পরে, ইন্দুমতী মনের অসহ্য দুঃখ ও যন্ত্রণায় নরেন্দ্রনাথের গৃহ পরিত্যাগ করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

অন্বেষণ।

রায়বাড়ীতে তুমুল হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে—ইন্দুমতী নাই, শৈলবালা নাই; দুজনার একজনও নাই। গিন্নী, এঘর ওঘর করিয়া, অন্দরমহলের সমস্ত ঘরগুলি খুঁজিতেছেন। কিন্তু কোথায়ও খুঁজিয়া পাইতেছেন না। না পাইয়া, শিরে করাঘাত করিতেছেন—কাঁদিতেছেন। কর্ত্তা, উৎকণ্ঠিত চিত্তে, একবার বাহিরবাড়ী, আবার অন্দরমহলে আসিতেছেন—যাইতেছেন। ক্ষেত্রমণি, চিন্তামণি, রামমণি রাসমণি, সখিমণি প্রভৃতি দাসী মাগীগুলি, অন্দরমহলের চারিদিকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া, পরিশ্রান্তা হইতেছে। কিন্তু, কেহই ইন্দুমতীকে কি শৈলবালাকে অন্বেষণ করিয়া পাইতেছে না।

রায়বাড়ীর যত আমলা, গোমস্তা, কর্ম্মচারী, পাড়েঠাকুর প্রভৃতি সকলেই উদ্বিগ্নচিত্তে ইন্দুমতীর অন্বেষণার্থ, গ্রামের ভিতর ইতস্ততঃ ছুটিতেছেন—তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতেছেন। কর্ত্তা, প্রজাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিয়া দিলেন যে, যে প্রজা ইন্দুমতীকে আনিতে পারিবে, কি তাহার কোন খোঁজ খবর বলিতে পারিবে, সে নিষ্করে দশ বছর বাস করিতে পারিবে। কর্ত্তা, ইহাও প্রচার করিলেন যে, যে কেহ ইন্দুমতীর সংবাদ দিতে পারিবে, তাহাকে যথেষ্ট পারিতোষিকও প্রদান করিবেন। প্রজা মহলে, প্রজাদের পুরস্কারের

কথা বাহুল্যরূপে প্রচারিত হইল। এক প্রজার মুখে, অন্য প্রজায়, অন্য প্রজার মুখে আবার আর এক প্রজায়, পুরস্কারের কথা শুনিতে লাগিল। প্রজারা তখন আনন্দোৎফুল্ল হইয়া, অমনি যে যাহার হাল লাঙ্গল, গরু বাছুর ফেলিয়া রাখিয়া, ইন্দুমতীর অন্বেষণার্থ বাহির হইল। প্রজারা কিন্তু কেহই ইন্দুমতীকে চিনে না। কাজেই, তাহাদের অতি বড় আশা যে বিফল হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

পাড়ার বৌ ঝিয়েরা, পুরস্কারের আশায়, আপন আপন শয়ন মন্দিরের নিভৃতস্থান সমূহ উপর্য্যুপরি খুঁজিতে লাগিলেন। যাঁহার মনে দৃঢ়বিশ্বাস যে, তিনিই পুরস্কার পাইবেন, তিনি যে কতবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া খুঁজিলেন; তাহার ইয়ত্তা নাই। বৌয়েদের মধ্যে কেহ ভাবিলেন, যদি তাঁহার শয়ন ঘরে ইন্দুমতীকে পান তবে লব্ধ পুরস্কার দিয়া, তিনি, তাঁহার দিদির বড় ছেলে খোকাবাবুকে একটী চিনের পুতুল কিনিয়া দিবেন। পুতুলটি কত ছোট হইবে?

মেয়েরাও ভাবিল যে, যদি কোথারও ইন্দুমতীকে পায়, কি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে, তবে, তাহারও পুরস্কারের কিঞ্চিৎ দিয়া, সইকে এক জোড়া কাশ্মীরি চুড়ী কিনিয়া দিবে। কিন্তু, তাহাদের কাহারও অদৃষ্টে পুরস্কার ঘটিল না। ইহাতে বৌয়েরা ও মেয়েরা ভারী দুঃখিত হইলেন। আমরা বলি, অনুশোচনায় ফল কি? বরং নিজ নিজ তেল সিন্দুরের বাক্স হইতে দুচারি পয়সা ব্যয় করিয়া, অভিলাষ পরিপূর্ণ করুন। তাহাতে আত্মমর্য্যাদাও আছে। এটি কি ভাল পরামর্শ নহে?

গ্রামময় ইন্দুমতীর পলায়ন বার্ত্তা রাষ্ট্র হইয়াছে। নীচবংশীয় কতকগুলি স্ত্রীলোক কক্ষে জলকুম্ভ লইয়া জল আনিতে যাইতেছিল। তাহারাও এ সংবাদ শুনিয়াছিল। পথিমাঝে, একে অন্যকে কহিল,

"দিদি, শুনেছিস্, রায়েদের বৌ নাকে পালিয়ে গেছে?"

অপরা, বিস্মিতভাবে কহিল,

"বলিস্ কি, বোন? বলিস্ কি? তুই কাহার মুখে শুন্‌লি?"

তৃতীয়া আর একটি রমণী মুখ বিকৃত করিয়া, "নথ" ঝাড়া দিয়া, নিজের সতীত্ব প্রকাশার্থ কহিল,

"যা, বোন, যা; ওকথা আর তুলিস্‌নে! আমরা হ'লে গলায় দড়ি দিয়ে মত্তেম। এমন ঘরের বৌ—"

এর পর, কয়েকটি কি কথা প্রথমা ও দ্বিতীয়ার কাণে কাণে বলিল। স্ত্রীলোকের স্বভাব,—জানুক আর নাই জানুক, তিলকে তাল করেন। সত্য বলিতে যেন তাহাদের মুণ্ডপাত হয়। এ স্ত্রীলোকটিও যতদূর বাড়াইয়া বলিতে হয়; বলিতে ত্রুটি করিল না।

তখন দ্বিতীয়া রমণী. আশ্চর্য্যভাবে বলিল,

"ছি! ছি! ঘেন্না! ঘেন্না! এমন কাজও মেয়ে মানুষে করে? তুই কি করে জান্‌লি, বোন?"

তৃতীয়া। কেন? কাল রাত্রিতে উনি বলেছেন। বোন, বড় লোকের বৌ হ'লেই হয় না। স্বভাব দোষ যাইবে কি প্রকারে? ঐ যে কথায় বলে,

ভাঙ্গা কুলায় ফেলে ছাই।
গোয়াল ধরে থাকে গাই॥

যাহার যেমন স্বভাব, তাহার তেমন কার্য্য। কোন্ ঘরের, না কোন ঘরের একটা মেয়ে আনিয়া, জমিদার বাবুর এত অপমান,— এত লাঞ্ছনা! দেশ শুদ্ধ লোকে, এ কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন; সেই নিষেধ শুনিলেন না। এখন কেমন তাহার ফল হইল? জমিদার মানুষ, যা করেন তাই শোভা পায়! আমরা হইলে এতদিন একঘরে হয়ে থাক্‌তেম।

এই বিষয় লইয়া, তাহারা হাস্য পরিহাস করিতে করিতে চলিয়া গেল। স্বামীর দোহাই দিয়া, স্ত্রীলোকটি, যাহা বলিল, প্রকৃতপক্ষে তাহার স্বামী, সে বিষয় কিছুই জানেন না, অথবা বলেন নাই; অন্যান্য স্ত্রীলোকগুলির বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত, স্বামীর দোহাই দিলেন। কোন কথা বলিয়া, স্বামীর নাম ব্যতীত, স্ত্রীলোকের পরিত্রাণ পাইবার আর উপায় নাই। ধন্য, রমণীকুল!

অকস্মাৎ আবার একটা তুমুল গণ্ডগোল পড়িয়া গেল,—"বৌ আসিতেছে", "বৌ আসিতেছে"। সকলের মুখেই ঐ এককথা—বৌ আসিতেছে। কর্ত্তামহাশয় ত এ সংবাদ পাইয়াই মহোল্লাসে, তাড়াতাড়ি, বাড়ীর সদর রাস্তার অগ্রভাগে আসিলেন। আসিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, কোথায়ও বৌ আসিবার লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। কিছুকাল পরে দেখিলেন, একখানা পাল্কীর পশ্চাতে পশ্চাতে, একটী লোক খুব বেগে দৌড়িয়া আসিতেছে। রায়মহাশয় তখন ঠিক করিলেন যে, এই পাল্কীতেই হয়ত বৌ আসিতেছে। কর্ত্তার কর্ম্মচারী মহাশয়গণও কর্ত্তার মতেই মত দিলেন এবং পাল্কীর অপেক্ষায় সকলে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আনন্দে সকলেই বিভোর

দেখিতে দেখিতে পাল্কীখানা, সদর রাস্তার অগ্রভাগ দিয়া, অন্যপথে চলিয়া গেল। পাল্কীর সঙ্গীকে, একজন কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথায় যাইবে? সঙ্গী উত্তর করিল যে, তাহার মাতার বড় কঠিন ব্যারাম; তাই, শ্বশুর বাড়ী হইতে স্ত্রীকে লইয়া আসিতেছে। সকলের বিশ্বাস ছিল, লোকটা রায়বাড়ী চিনে না বলিয়াই, বৌকে অন্যপথে লইয়া যাইতেছে। কিন্তু সঙ্গীর উত্তর শুনিয়া, সে অন্ধ বিশ্বাস বিদূরিত হইল। সকল আশা ভরসা ফুরাইল। কর্ত্তার পরিবারে বিষাদ জন্মিল।

সেইখানে কতকগুলি বালক দণ্ডায়মান ছিল। যখন দেখিল যে, এ বৌ রায়দের বাড়ীর নহে; তখন বালকের দল পাল্কীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। পরে, হাততালি দিতে দিতে স্বর তুলিয়া, বলিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল,

"কলা গাছে, ঢোঁড়াসাপ।
পাছের বেটা বৌর বাপ॥"

কেহ কেহ বলিল,

"কাঁধের বাঁশে পড়িল বাড়ি।
বৌ দিয়ে যাও আমার বাড়ী॥"

কেহ কেহ আবার পাল্কীর বাহকদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল,

"হাতে লাঠি কাঁধে বাঁশ।
মাগীর মোড়া কৈ যাস্?"

এদিকে অন্বেষণকারীগণ, সকলেই ভগ্নোৎসাহ হইয়া একে একে বাড়ীতে ফিরিতে লাগিল। কেহই ইন্দুমতী কি শৈলবালার খোঁজ করিতে পারিল না। এমন কি সামান্য একটু সংবাদও কোথায় জানিতে সক্ষম হইল না। কর্ত্তা, এ সমস্ত শুনিয়া, বিরসবদনে বসিয়া বসিয়া, অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

—[০]—

শূন্যগৃহে।

নরেন্দ্রনাথ, ইন্দুমতীর গৃহ পরিত্যাগের পর, দশ পনর দিন পর্য্যন্ত শয়ন-মন্দিরে আসে নাই। কি জানি কি মনে করিয়া আজ আসিল। শয়নকক্ষে আসিয়াই কিয়ৎকাল কাঁদিল। কাঁদিয়া শেষে, উন্মত্তবৎ ইন্দুমতীর যত আদরের সামগ্রী ছিল; সেই সকল ভাঙ্গিতে লাগিল।

ইন্দুমতীর অতি আদরের একটি স্বর্ণ-নির্ম্মিত পানের ডিবা ছিল; নরেন্দ্রনাথ, অগ্রে সেটি আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিল। পরে ইন্দুর চিরুণী, আয়না, ফুলালতেলের শিশি, কাচের গ্লাস, উৎকৃষ্ট কাচের ডিস, একে একে সকলই ভাঙ্গিল। তারপর ইন্দুমতী যে, নিজে উল দিয়া, অতি পরিপাটী করিয়া, বড় বড় দুটি বাজপাখী আঁকিয়াছিল এবং নরেন্দ্রনাথই যেই দুটিকে অতি যতনে স্বর্ণ-নির্ম্মিত ফ্রেমে বাঁধাইয়া আনিয়াছিল সেই পাখী দুটি খুলিল; গ্লাস, ফ্রেম প্রভৃতি ভাঙ্গিল। পাখী দুটির মাথার উপর লেখা ছিল:—

"আমার হৃদয়াকাশের একমাত্র ধ্রুবতারা—
নরেন্দ্রনাথ রায়কে উপহার দিলাম।"

সেবিকা, ইন্দুমতী।

অবশেষে, সেই লেখাগুলি ও সেই সর্ব্বজন প্রশংসিত পাখী দুটিকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া, ছিন্নভিন্ন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ছিঁড়িতে পারিল না! ছিঁড়িতে না পারিয়া, পদতলে বিদলিত করিল। পাখী দুটির সুশ্রী বিলুপ্ত হইল। ঐ সঙ্গে সঙ্গে রচয়িত্রীর গুণপনাও চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল। নরেন্দ্রনাথ! এমনি করিয়া কি পদে দলিতে হয়? ছি!

ইহার পর, নরেন্দ্রনাথ যে পালঙ্কে শয়ন করিত, সেই খাঠখানা উল্টাইয়া ফেলিল এবং তদুপরি বসিয়া ভাবিতে লাগিল। প্রথমে ভাবিল, ইন্দুমতীর সেই শরদিন্দু নিভানন; ইন্দুর স্পর্শ সুখ—ইন্দুর পীযূষ পরিমিশ্রিত কথা! পরে ভাবিল, হায়! আমি রতন চিনিলাম না কেন? আমার এমন দিব্যচক্ষু থাকিতেও অবহেলায় দুষ্প্রাপ্য মাণিক বিনষ্ট করিলাম! আমি বানর, রত্নের মর্ম্ম কি বুঝিব? না জানি, ইন্দুমতী যাইবার সময়ে আমাকে দেখিবার জন্য কত কাঁদিয়াছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ মুখ কত স্ফীত করিয়াছে? আমি কঠিন,—পাষাণ সমান কঠিন! আমার বিবেকশক্তি নাই—আমি নর-পিশাচ! পিশাচের সহিত স্বর্গীয় দেবীর মিলন হইবে কেন?

এই ভাবিয়া নরেন্দ্রনাথ, সহসা বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নিজে নিজেই অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল। বলিল, কি? কি? আমি নরেন্দ্র, ইন্দুমতীকে পদাঘাত করিয়াছি? অসম্ভব! এখনও এতদূর নিষ্ঠুর হই নাই। হইয়াছি—যখন ইন্দুমতীকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছি, তখন আমার অসাধ্য কিছুই নাই!

আমি সকলি করিতে পারি। চুরি বল, ডাকাতি বল, খুন বল, পৃথিবীর যাবতীয় পাপ ও ঘৃণিত কার্য্য, সকলই আমার দ্বারা সুসাধিত হইতে পারে। যাহার ভাল মন্দ, হিতাহিত জ্ঞান নাই, সে কি মানুষ? কি কষ্ট! কিছুদিন যেতে না যেতেই, আমার হৃদয়টা শূন্য বলিয়া অনুভব হইতেছে কেন? আঁধার ঘরে লোক থাকা সত্বেও যেমন কেহ নাই বলিয়া প্রতীতি জন্মে তেমনি যেন প্রাণটা করিতেছে। বোধ হয়, আমার কি যেন নাই! যাহার বলে এতদিন বলীয়ান ছিলাম এখন যেন সেই জিনিষটি হারাইয়াছি। সেই জিনিষটি থাকিলে বুঝি হৃদয় দুর্ দুর্ করিত না—প্রাণ এত উদাস হইত না। এ গৃহ কি ছিল, এখন কি হইয়াছে? ইন্দুমতীর গৃহ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে, গৃহটিও যেন কুৎসিত হইয়া গিয়াছে। যাহার ধন সে যত্ন না করিলে, কে করিবে? অন্যে শত সহস্র করিলেও নিজের মত হয় কি?

তখন নরেন্দ্রনাথ, ব্যাকুলভাবে জানালার নিকট আসিয়া আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিল, চাঁদ উঠে নাই; তারাও ফুটে নাই। অন্ধকার রজনী বলিয়া, নরেন্দ্রনাথ তরু, লতা, পাতা, ফুল'ফল, কিছুই দেখিতে পাইল না। নৈশ-গগনে বিহার করিতে করিতে, 'বউ কথা কও' পাখীও ডাকিতেছে না। ইন্দুমতী থাকিতে, নরেন্দ্রনাথ এই জানালার নিকট দাঁড়াইয়া, লতা পাতায়, ফুলে ফলে নিহিত চাঁদের রজত কিরণাভা দেখিত—ইন্দুকে অঙ্গুলী সঙ্কেতে দেখাইত এবং উভয়ে হৃদয় খুলিয়া, কত কথোপকথন, কত রহস্য, কত আমোদ প্রমোদ করিত, ইয়ত্তা

নাই। কিন্তু, আজ নরেন্দ্রের মনে বিন্দুমাত্রও আনন্দ নাই; বরং সেই সমস্ত পূর্ব্বস্মৃতি মনে উদয় হওয়ায় যথোচিত কষ্ট হইল। নরেন্দ্রনাথ, দেখিয়া শুনিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনে মনে ঠিক করিল যে, ইন্দুমতীকে সকলেই ভালবাসে; তাহার দুঃখেই পৃথিবী বিষাদের ছায়ায় বিজড়িত হইয়াছে—কেহই তেমনটি নাই।

আছে কেবল—নরেন্দ্রনাথ !!

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

পত্র।

তারাকান্ত, নরেন্দ্রনাথের প্রতিবাসী ও বন্ধু। বলিতে গেলে, উভয়ে একআত্মা—একপ্রাণ। যেন হরিহরাত্মা! প্রভাতে উঠিয়া, তারাকান্তের ভৃত্য, তারাকান্তকে একখানা চিঠি দিল। তারাকান্ত, নরেন্দ্রনাথের হাতের লেখা চিনিত। লেখা দেখিয়া, নরেন্দ্রের পত্র চিনিতে পারিল। এত সকালে, নরেন্দ্রের পত্র পাইয়া, অত্যন্ত উৎদ্বিগ্ন হইল, এবং তাড়াতাড়ি পত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িল,—

"তারাকান্ত,

বাসনা ছিল, তোমাকে গুটি দুই মনের কথা বলিয়া যাইব। সে অভিলাষ, ইচ্ছা করিলে, পরিপূর্ণ করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা করিলাম না; করিলে তুমি আসিতে দিতে কি? তোমার চোখে যমুনা বহিতে দেখিলে ও সুদীর্ঘ নিশ্বাস বহিলে আসিতে পারিতাম কি? কখনও না। তুমি হয়ত বলিবে, পাষাণে কর্দ্দম থাকে কি? সে কথাও যথার্থ। আমি এখন পাষাণ হইতেও কঠিনতম। সামান্য চোখের জলে, আমার বজ্রসম কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হয় না। যখন ইন্দুমতীকে পায়ে ঠেলিতে, আমার পাষাণ প্রাণ বিগলিত হয় নাই

তখন আমি কি মানুষ? এ সংসারে মানুষ চিনা দুষ্কর! কে যে কি ভাবে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, তা কে বলিতে পারে? কে বলে মানুষ দেবতা? মানুষ,—রাক্ষস। এ রাক্ষসে না করিতে পারে, এমন কার্য্য ইহ জগতে কিছুই নাই। নৈলে পাপিয়সী গৌরমণি, আমাকে কি জানি কি কুহকে ভুলাইয়া, আমার সোণার সুখের জীবনটি ভাঙ্গিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতে পারিত কি? প্রায় মাসেক হইল, তুমি আমাকে প্রতুলের শত্রুতার যথেষ্ট প্রমাণ দেখাইয়াছ—দেখাইতেছ; এবং এই কার্য্য করিয়াই যে পাপাত্মা প্রতুল ও গৌরমণি দেশত্যাগী হইয়াছে, তাহারও প্রচুর প্রমাণ দিতে ত্রুটী কর নাই। এখন বুঝিয়াছি, আমার দোষেই, ইন্দুমতী গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে।

ভাই, এখন সেই ভীষণ মুহূর্ত্তের কথা মনে পড়িলে সমস্ত শরীরে যেন তীক্ষ্ণবিষপ্রবাহ উৎপ্লুতভাবে ছুটিতে থাকে। বস্তুত যাহার প্রেমালিঙ্গনে, যাহার অমিয় মাখা প্রেম-পীযূষ পরিপূর্ণ সতৃষ্ণ দরশনে, আমার আঁধার হৃদয়ে শশধরের কোমলসুস্নিগ্ধদীপ্তিতে ফুটোন্মুখ কুসুম-কোরকের ন্যায় ধীরে ধীরে অনন্ত আনন্দ জন্মিত, হায়! নিরর্থক সেই ইন্দুমতীকে পায়ে ঠেলিয়া এখন শূন্য প্রাণের অনন্ত যাতনা উপভোগ করিতেছি। এখন আমার হৃদয়ে সেই সুখ নাই, সেই স্ফূর্ত্তি নাই, পূর্ব্বের কিছুই নাই। থাকিবার মধ্যে কেবল আছে—অনুতাপানল। তারাকান্ত, সেই অনল যে কত প্রখরভাবে জ্বলিতেছে, তাহা আর তোমাকে কি বলিব? বুক চিরিয়া দেখাইতে পারিলে সেই অনল-শিখা দেখাইতাম।

ইহ জগতে যদি কিছু সুখ থাকে, তবে, সে স্ত্রীর পবিত্র ভালবাসা। ইহার নিকট স্বর্গসুখও তুচ্ছ। নিদারুণ বিষাদে, যখন হৃদয় জর্জ্জরিত হয়, যখন গভীর শোকে শরীর বিবশ হয়, তখন যদি স্ত্রীর ভালবাসা পরিপূরিত লোচনের পানে, একবার নিরীক্ষণ করা যায়, তবে, মুহুর্ত্তের ভিতর সেই ভীষণশোকসন্তাপ বিদূরিত হইয়া অনন্ত আনন্দ জন্মিয়া থাকে। এ জগতে, সেই সুখের তুলনা হয় না। বিবাহ করিলে, এ সব জানিতে পারিবে। বিধাতার সৃষ্টিতে কত সুখের, কত নয়নপ্রীতিকর সামগ্রী পড়িয়া আছে; অভাব নাই। কিন্তু, এখন আমার সেই সকলে কিছুমাত্র সুখ হইতেছে না। প্রাণ উদাস্ উদাস্ করিতেছে, কিছুতেই ভাল জ্ঞান হইতেছে না। বুঝি, জগতে স্ত্রীই শান্তিদায়িনী! কিন্তু বুঝিয়াও কি করিলাম? বিনা দোষে, বিনা অপরাধে, সেই অতীব ভালবাসার জিনিষ, যাহাকে মাটিতে রাখিতে কষ্ট হইত, যখন সেই অতি আদরের ইন্দুমতীকেই, জনমের মত বিসর্জ্জন দিয়াছি, তখন আর সুখের আশা কি? ইন্দুমতী, আমার সুখ ও শান্তি নিয়াছে; এখন আমি সেই সুখের অন্বেষণে চলিলাম। যদি খুঁজিয়া পাই, তবেই ফিরিব; নতুবা এই পত্রই শেষ দেখা বলিয়া জানিও।

আর একটি কথা। শূন্য পিঞ্জরা রাখিয়া ফল কি? পাখী থাকিলেই পিঞ্জরার আদর। পাখীর বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে পিঞ্জরার আবশ্যকতা ও আদর ঘুচিয়া যায়। আমারও সেই অবস্থা হইয়াছে। ইন্দুমতীর জন্যই, এতদিন এ দেহ ধারণ করিয়াছিলাম। সেই

পাগুলিই যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন আর এ শূন্যহৃদয়পিঞ্জরার প্রয়োজন কি? কাহার জন্য আর এ দেহের আদর যত্ন করিব? ইন্দুমতী গৃহে থাকিলে, মরিতে অভিলাষ হইত না। তখন ভাবিতাম, মরিলে ত ইন্দুর ইন্দুবদন দেখিতে পাইব না; ইন্দুমতীরও অনন্ত দুঃখ ক্লেশ হইবে।" কিন্তু, এখন স্থির করিয়াছি, জলে, রৌদ্রে ও অনাহারে, যে প্রকারে পারি, এ দেহ বিসর্জ্জন দিব। শূন্য পরাণের যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।

শেষ কথা। পৃথিবীর কোন বস্তুই, আমার নিকট ভাল বোধ হয় না। সকলি বোধ হয় যেন মলিন,—কেমন কেমন। তুমি হয়ত নব কিশলয় ও ফুলে পরিশোভিত মাধবীলতা দেখিয়া বিমুগ্ধ হও; অথবা বসন্তকালের শেষ রজনীর রমণীয় ঘুমন্ত জোছনা দেখিয়া এবং শুইয়া শুইয়া "বউ কথা কও" পাখীর সুললিত রব শুনিয়া, নিতান্ত প্রীতি উপভোগ কর। আর হয়ত আধ ঘুমন্ত ঘোরে পঞ্চম রাগিণীতে কাহারও কোকিল কণ্ঠের গান শ্রবণ করিয়া বিমোহিত হইয়া থাক। কিন্তু, ভাই, এখন আমি ইহার কিছুতেই কি সুখ, কি প্রীতি, কি আনন্দ, কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না। পূর্ব্বে পারিতাম। এখন এ সকল যেন বিষাক্ত বলিয়া প্রতীতি হয়। ইচ্ছা হয়, যেখানে এ সব দেখি বা শুনি, সেখান হইতে চলিয়া যাই। আমি ঘোর মূর্খ কোথায় যাইব? যাইবার স্থান আছে কি?

আর এক দুঃখ, জগত ছাড়া সরিষা পরিমাণ স্থান নাই। কাজেই, যেখানে যাইব, সেইখানেই ইন্দুমতীর আদরের অনেক

সামগ্রী দেখিতে পাইব। ইন্দুর ভালবাসার জিনিষ দেখিলে হৃদয় ফাটিয়া যাইতে থাকে। ইন্দুমতী আমার যুঁই, চাঁপা, বেল, গোলাপ, প্রভৃতি ফুল ও পরিষ্কার নিখুঁত চাঁদের কিরণ দেখিতে বড় ভালবাসে, বল দেখি ভাই, আমি এই সকলের হাত হইতে, নির্মুক্ত হইব কি প্রকারে? কুসুমের অভাব ঘটিতে পারে; কিন্তু, আকাশে চাঁদ ফুটিলে, কোথায় পলাইব? এবং না দেখিয়াই বা কি প্রকারে থাকিব? তাই বলিতেছিলাম যে, যদি জগত ছাড়া দাঁড়াবার স্থানটি থাকিত, তবে, না হয় এ সকল পরিত্যাগ করিয়া, সেইখানে যাবজ্জীবন থাকিতাম। আশা করি, তুমি অতি সত্বর, ইহার একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়া পাঠাইবে। আমার ভাল মন্দ বিচার শক্তি লোপ পাইয়াছে। তুমি ভিন্ন, এখন আর আমার বলিতে কেহ নাই। এ হতভাগাকে ভুলিও না। তুমি আমার চোখ ফুটাইয়াছ; সেই ঋণ এ জনমে শোধ করিতে পারিব না।

তোমাদের—হতভাগা,
নরেন্দ্রনাথ।"

এই পত্রখানা রজনীতে, নরেন্দ্রনাথ, তারাকান্তের নিকট রাখিয়া গিয়াছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আর না, সই।

রজনী, গভীরা—ঘন তিমিরাচ্ছন্না, সম্মুখস্থ বস্তুও দৃষ্টি গোচর হয় না। আকাশে কিছু কিছু মেঘের আভাস পরিলক্ষিত হইতেছে। বোধ হইতেছে, যেন শীঘ্রই বৃষ্টি হইবে। মেঘের ভিতরে ভিতরে সামান্য রকম বিদ্যুৎ খেলিতেছিল।

এমন সময় অসূর্য্যম্পশ্যা ইন্দুমতী, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিল। গৃহের বাহিরে পা দেওয়া মাত্র, ইন্দুমতীর বিষাদের সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। এবং দুই এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। ইন্দুমতী তখন উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিল। ছুটিলে হইবে কি? দেখিতে দেখিতে ঝড় ও বৃষ্টি হু হু রবে জগত আলোড়িত করিয়া তুলিল। ইন্দু, নিঃসহায় অবস্থায় কাঁদিতে লাগিল। বৃষ্টির জলের সঙ্গে, ইন্দুমতীর নয়নাশ্রু বিমিশ্রিত হইয়া গেল।

তখন অতি পবিত্রা ইন্দুমতী নিরুপায় ভাবিয়া, পথভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিল। কোন পথে, কোন দিকে যাইবে, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না। উপর্য্যুপরি ঘুরিয়া ঘুরিয়া একস্থানেই বার বার আসিতে লাগিল। নিবিড় আঁধারে জগত সমাচ্ছন্ন বলিয়া, ইন্দুমতী কোন পথও ধরিতে পারিল না। বিশেষত

ইন্দুমতী পথ ঘাটও চিনে না। কারণ, সে কখনও গৃহের বাহিরে পা দেয় নাই। কিছুকাল পরে, ঝড় ও বৃষ্টি কমিয়া আসিল। কেবল ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। ইন্দুমতী, সেই তড়িৎ বিভায় যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। তড়িৎ বিকাশ ও বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বাহিরে আসিয়া পড়িল।

গ্রামের বাহিরে প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠ ভরিয়া ঘন ঘন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তাল বৃক্ষ। বৃক্ষগুলি শিরোন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সেই সকল বৃক্ষচ্ছায়া অবলোকন করিয়া ইন্দুমতীর মনে ভয় জন্মিতে লাগিল। কিন্তু, ভয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, নরেন্দ্রনাথের নাম লইতে লইতে মাঠ পার হইল। মাঠ পার হইয়াও দুই ক্রোশ হাঁটিল। হাঁটিতে অনভ্যস্ত বলিয়া, ইন্দুমতী সত্বরই অত্যন্ত পরিশ্রান্তা হইয়া পড়িল।

তখন ঝড় ও বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে; বিদ্যুৎ ফুটিতেছে না। চাঁদ উঠিতেছে, যেন স্নান করিয়া। সেই স্নাত চন্দ্রালোকে, ইন্দুমতী অনতিদূরে একটি বাগান দেখিতে পাইল। ভাবিল যে, বাগানে বসিয়া, একটু বিশ্রাম করিবে। এই ভাবিয়া বাগানের অভিমুখে যাইতে লাগিল। ক্রমশ হাঁটিতে হাঁটিতে বাগানে আসিয়া পৌঁছিল। দেখিল, বাগানের মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড দীঘি। দীঘির চারি পারে পাকা রাণার ঘাট। দীঘির জল স্বচ্ছ-স্ফটিক তুল্য নির্ম্মল। দীঘিটি অত্যন্ত পুরাতন। দীঘির ভিতর মাঝে মাঝে উৎপল, রক্ত ও শ্বেতবর্ণের কুমুদের গাছ জন্মিয়াছে। প্রফুল্ল কমলদলে চাঁদের কিরণ নিপতিত হওয়ায়, নবীনা যুবতীর হাসির

ন্যায় দেখা যাইতেছিল। ইন্দুমতী ইহা নিরীক্ষণ করিয়া, আর বসিল না। একটী ঘাটে নামিতে লাগিল। কেন? তা সেই জানে। একটী, দুটি, তিনটি করিয়া, প্রায় কুড়ি পঁচিশটি সোপান ভাঙ্গিয়া, জলের নিকট আসিল। পরে, বসিয়া বসিয়া জল নাড়িতে নাড়িতে, নিজে নিজেই কি জানি কি বলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে পা দুখানার কিয়দংশ জলের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিল। জলের ভিতর হইতে, সেই অনিন্দ্য-সুন্দর পায়ের জ্যোতি, মেঘবিতাড়িত চাঁদের ন্যায় ফুটিয়া বাহির হইল। ইন্দুমতী, নির্ভয়ে ধীরে ধীরে গলা জলে নামিল। এবং কি ভাবিয়া জানি অনেকক্ষণ পর্যান্ত ডুব দিয়া রহিল। কিন্তু, অনেকক্ষণ থাকিতে পারিল না। নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল—অমনি উঠিয়া পড়িল। ইন্দু, তুমি কি মরিতে চাও? জলে কি এই ভাবে মরিতে হয়? তুমি মরিতে জান না; তবে মরিতে এসেছ কেন? ঘরে ফিরিয়া যাও।

ইন্দুমতী আমাদের কথা শুনিল না। মরিবার জন্যই দৃঢ়সংকল্প করিল এবং আরও গভীর জলে নামিতে লাগিল। সহসা একটী সঙ্গীত তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। কে যেন পার হইতে গাহিল;—

পিরীতি সাগরে তুফান উঠিল রে।
তরঙ্গে তরঙ্গে বিষ উছলিল রে॥
কাম নাই অবগাই, এসো মোরা বনে যাই,
শ্যাম নাম জপি' কাঁদিব ফুকরি রে।
ধরা নাহি দেয় শ্যাম না কাঁদিলে রে॥

...ত্যন্ত অনুরোধ করিতে আরম্ভ ...কল,
...নুরোধ উপ... কর কি, সই? কর কি? আমি যে এসেছি।"

গান শুনিয়া ইন্দুমতী চমকিয়া উঠিল এবং স্বর চিনিতে পারিল। জলে ডুবিয়া আর মরিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি জলের ভিতর হইতে উঠিয়া আসিল। পরে, বলিল,

"শৈল, তুইও আমার পথের কণ্টক হ'লি?"

ইন্দুমতী আর কিছু বলিতে পারিল না। শৈলবালা যাইয়া অমনি ইন্দুমতীর গলা জড়াইয়া ধরিল। উভয়ের চোখে তখন মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইয়া উভয়ের বক্ষ ভাসাইয়া দিল। রমণীর হৃদয় যেমন পরদুঃখে বিগলিত হয়, তেমন আর কাহারও হয় কি?

যখন ইন্দুমতী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আসিতেছিল, তৎকালে শৈলবালাও কোন কারণবশত গৃহের বাহিরে আসিয়াছিল। তখন কণা কণা বৃষ্টি পড়িতেছিল। শৈলবালা, ইন্দুমতীকে উন্মাদিনীবৎ ছুটিতে দেখিয়া, অনুমান করিয়াছিল যে, বিশেষ কোন দুর্ঘটনা ব্যতীত, এরূপ দুর্যোগের সময় কোথায়ও যাওয়া সম্ভবপর নহে। ইন্দুমতী দ্রুতপদে চলার দরুণ ভাল মন্দ জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশ পাইল না। বিশেষত, শৈলবালাকে সেই মুহূর্তে নিজের শয়ন ঘরে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। কাজেই, ফিরিয়া আসিতে আসিতে, ইন্দুমতী অনেক দূর সরিয়া পড়িয়াছিল। শৈলবালা তখন ইন্দুমতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কিন্তু আঁধারের নিমিত্ত তাহাকে দেখিতে পাইল না। অনুমানে চলিতে চলিতে বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দীঘির পারে যাইয়া ইন্দুমতীকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া

প্রথমে কিছু বলিল না; কেবল ইন্দুমতী ইহা নিরীক্ষণ করিয়া, আর কিন্তু, যখন বুঝিল, ইন্দুমতী মরিবার নিমিত্ত কেন? তা সেই দিতেছে, তখন শৈলবালার মনে বড় ভয় হইল। মনের আবেগে গান ধরিল। সেই গান শুনিয়াই, ইন্দুমতী আর জলে ডুবিয়া মরিতে পারিল না।

যাহাহউক, শৈলবালা ইন্দুমতীর চোখের জল স্বীয় অঞ্চলে মুছাইয়া দিল। পরে, ব্যগ্রতার সহিত কহিল,

"সই, এখানে আসিলে কেন?"

ইন্দুমতী নীরব। কিন্তু, এই কথায়, ইন্দুমতীর অশ্রু-প্রবাহ স্রোত-জলের ন্যায়, উছলিয়া ছুটিতে লাগিল। শৈলবালা পুনরায় কহিল,

"সই, বল কি হয়েছে?"

ইন্দুমতী তথাপি নিরুত্তর। শুধু, তাহার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রু ঝরিতে লাগিল। শৈলবালা, ইন্দুমতীকে তদবস্থ দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইল। বলিল,

"একি! সই, একি? কেবলি কাঁদিতেছ কেন?"

এবার ইন্দুমতী, চিত্তোদ্বেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া কহিল,

"সই, প্রাণ জ্বলে বলে কাঁদি। ম'রবার জায়গা খুঁজে পাইনি তাই, এখানে মরিতে এসেছি।"

শৈলবালা উৎকণ্ঠার সহিত বলিল,

"ছি! সই, ছি! ও কথা বলিতে নেই।"

শৈলবালা তখন প্রকৃত ঘটনা জানিবার নিমিত্ত, ইন্দুমতীকে

অত্যন্ত অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিল। ইন্দুমতীও শৈলবালার অনুরোধ উপরোধ এড়াইতে পারিল না। একে একে অকপটে, বিগলিত নয়নে নরেন্দ্রনাথ ঘটিত সমস্ত কথা বিবৃত করিল। শুনিয়া শৈলবালা ঈষৎ হাসিয়া কহিল,

"ছি! ইহার জন্য মরিতে এসেছ? সই, মরিলে কি এ জীবনে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইবে? আত্মহত্যা, মহাপাপ! সেই পাপের ফলে পরজন্মেও কি তাঁহাকে হারাবে?"

ইন্দুমতী সকাতরে কহিল,

"সই, যে দুঃখে আমার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে, তার চেয়ে বরং মৃত্যুই ভাল। আমার এমন ভাগ্য নাই, অথবা এমন কোন পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য ফলও নাই; যাহাতে পুনরায় স্বামীর সেবা করিতে পারিব। সে আশা, দুরাশা মাত্র।"

শৈলবালা, ইন্দুমতীকে অনেক প্রবোধ দিয়া কহিল,

"সই, দুঃখ করিও না। অবশ্য একদিন সুদিন আসিবেই চিরদিন আর লোকের কুদিন থাকে না। সুদিন কুদিন সকলেরই আছে, সই।"

ইন্দুমতী, সজল নয়নে কহিল,

"আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া, কোন দুঃখ নাই। তিনি সুখে ও ভাল থাকিলেই, আমার সুখ শান্তি। আমার দেবতার পূজা যে আমি করিতে পারিলাম না; সেই আমার বড় দুঃখ!"

শৈলবালা ইন্দুমতীকে আবারও বুঝাইয়া কহিল,

"সই, তোমার দেবতার উপর অন্যের কোন অধিকার নাই।" তাঁহার মূর্ত্তি ত অন্তরে গাঁথা আছে? এখন হৃদয়-কমলে বসাইয়া, ভক্তিভাবে পূজা করিতে থাক। এজন্মে না হয়, পরজন্মেও ত পাবে। তার আর ভাবনা কি, সই?"

ইন্দুমতী নীরব।

ইন্দুমতী, আর্দ্র বস্ত্রের নিমিত্ত শীতে কাঁপিতেছিল। শৈলবালা, তাহার কম্পিত কলেবর বিলোকন করিয়া, তাড়াতাড়ি কুক্ষি নিহিত একখানা কাপড় বাহির করিয়া দিল। বোধ হয়, আসিবার কালে, শৈলবালা, এ কাপড় আনিতেই গিয়াছিল। যাহাহউক, ইন্দুমতী কাপড় পরিল। শৈলবালা তখন ইন্দুমতীকে জিজ্ঞাসা করিল,

"সই, এখন কি করিবে? এসো, দুজনে বাড়ী ফিরে যাই।"

ইন্দুমতী, বিষাদে স্ফুরিতাধর হইয়া, কাঁদ কাঁদ ভাবে কহিল,

"সই, আর ওকথা বলিও না। সে পথে কাঁটা পড়িয়াছে। তিনি কি আর এ পোড়ামুখ দেখিবেন?"

শৈলবালা। কেন, সই?

ইন্দুমতী। তোমাকে ত সকলি বলেছি।

ইন্দুমতী আর কোন কথা বলিল না। মনে মনে ভাবিল, ফিরিয়া যাইতে কাহার না ইচ্ছা হয়? ঐ হৃদয়-গাথা মুখমণ্ডল কাহার না দেখিতে সাধ যায়? কিন্তু ফিরিব কি প্রকারে? ফিরিবার কি মুখ আছে? যে ঘৃণিত লোক-কলঙ্ক এ পোড়া কপালে পতিত হইয়াছে, তাহা মনে হইলে, এখনি বিষপানে এ দেহ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ হয়। আর মনে হয়—এ পোড়ামুখ

কেমনে লোকের মাঝে দেখাইব? আর কেনই বা তাঁহার প্রাণে যন্ত্রণা দিতে যাইব? ধরণী, তুমি দুই ভাগ হও; আমি তোমার ভিতরে প্রবেশ করিয়া, আমার এই অনন্ত যাতনার ও বেদনার অবসান করি। আবার ভাবিল, স্ত্রীর উচিত—স্বামীর সুখের পথ পরিষ্কার রাখা। আমি কেন সে পথের কণ্টক হইতে যাইব? পরে, প্রকাশ্যে কহিল,

"সই, আমি আর গৃহে যাব না। এখন আমার মরণই ভাল।"

এই বলিতে বলিতে ইন্দুমতীর চোখে মহানদী বহিল। কাঁদিল। শৈলবালা ভাবিয়াছিল যে, ইন্দুমতীর মনোকষ্ট কিছু উপশম হইলে বলিয়া কহিয়া বাড়ীতে ফিরাইয়া নিয়া যাইবে। কিন্তু ইন্দুমতীর প্রাণের গভীর বেদনা ও অনভিপ্রায় দেখিয়া, সে আশা একবারেই নির্ম্মূল হইল। তবুও ভাবিল, দেখি আর একবার বলিয়া যদি বাড়ী লইয়া যাইতে পারি। তাই, আবার বলিল,

"সই, চল গৃহে ফিরিয়া যাই।"

ইন্দুমতী, এবারও সবিষাদে কহিল,

"আর না, সই।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

—••○••—

পত্রোত্তর।

অল্প বেলা আছে। এমন সময়, বাহির বাড়ীর টুলের উপরে, তারাকান্ত ভগ্নমনে, ধুতীর কিয়দংশ গাত্রে দিয়া বসিয়া আছে। সম্মুখে কেহই নাই। সকলেই কাজ কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে। নরেন্দ্রের বিচ্ছেদজনিত কষ্টে, তারাকান্তের চোখে অশ্রু ঝরিতেছে। অশ্রু, তুমি নির্জ্জনে প্রবাহিত হও কেন? নীরবে প্রাণের বেদনা ফুটে কি?

হঠাৎ পিয়ন আসিয়া, তারাকান্তের হাতে একখানা পত্র দিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তারাকান্ত পত্র খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িল,—

কাশীধাম, যোগাশ্রম।
৪ আষাঢ়, ১২৬৬ সাল।

"তারাকান্ত,

এইমাত্র সাতদিনের গুরুতর পরিশ্রমের পর, কাশীতে এসেছি। ভাবিয়াছিলাম, এখানে আসিয়াই, বিশ্বেশ্বরকে দেখিতে যাইব; কিন্তু যাওয়া হইল না। আমি অসম্পূর্ণ; আমার, অর্দ্ধাঙ্গ নাই। একচোখে দেখিয়া লাভ কি? আর একচোখ পাইলে, ভবিষ্যতে দেখিবার অভিলাষ রহিল। বিশ্বেশ্বর কি সেই আশা পূর্ণ

করিবেন? এখানে এক পাণ্ড ঠাকুর বড়ই দয়ালু। তিনি অনুগ্রহ করিয়া কালি কাগজ না দিলে, এই পত্রও লিখিতে পারিতাম না। যাহাহউক, এই সাতদিনে যে সমস্ত দেশ, গ্রাম, নগর, বন ও উপবন দিয়া আসিয়াছি, তাহার কোথায়ও ইন্দুমতীর দেখা পাইলাম না। বোধ হয়, সে আমার প্রতি অভিমান করিয়া, কোথায়ও লুকাইয়া রহিয়াছে। না, আমি ভুল লিখিলাম। ইন্দু, আমার উপর অভিমান করে নাই। কারণ, কখনও ইন্দুকে অভিমান করিতে দেখি নাই। আমার চোখ নাই; বোধ হয়, সেই জন্যই তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না! আমার চোখে কি রোগ হইল, বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ জানিলে লিখিও।

আসিবার সময় একখানা পত্র লিখিয়া আসিয়াছি। বোধ হয়, এতদিন তাহা পাইয়া থাকিবে। সেই পত্রেই আমার মানসিক অবস্থা লিখিয়াছি। এখনও অনেক লিখিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু বেশী লিখিয়া, আর তোমাকে কষ্ট দিব না। আমার কষ্ট জানিয়া, তুমি কেন বিরলে কাঁদিবে? তোমার মঙ্গল প্রার্থী। আমি এক প্রকার আছি।

হতভাগা,—নরেন্দ্র।"

পুঃ,—আমার পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা করিও। তুমিও ত আমার এক ভাই। সংসারে একজন পাগল হয় বলিয়া, সকলেই আর হয় না? ইহ জগতে, পিতা, পুত্রের প্রত্যক্ষ দেবতা, এ কথা ভুলিও না।'

তারাকান্ত, পত্রখানা দুই তিনবার পড়িল। পড়িয়া, একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। পরে, তখনি পত্রোত্তর লিখিতে বসিল।

হাসিকান্না।
১৫ আষাঢ়। ৬৬

"নরেন্,

এইমাত্র তোমার পত্র পাইলাম। পূর্ব্বের পত্রও পাইয়াছি। তোমার অভাবে, আমরা সকলেই ম্রিয়মাণ। তুমি যে আমাদিগকে কি করিয়া গিয়াছ, তাহা আর পত্রে লিখিয়া কি জানাইব? বুঝিতে পারিয়াছি, তোমার হৃদয়ে, এখন অনন্ত যাতনার উদ্রেক হইয়াছে। ইন্দুমতীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাস; তাঁহার অভাবে না ঘটিতে পারে, এমন কিছুই নাই। এটিও বেশ বুঝিতেছি, তোমার যখন যথেষ্ট অনুতাপ হইয়াছে; তখন আর ইন্দুমতীকে পাইতে বেশী বিলম্ব হইবে না। অনুতাপের পরই শান্তি— অনিবার্য্য। প্রার্থনা করি, বিশ্বেশ্বর তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। আর এক কথা, বিশ্বেশ্বরকে না দেখিয়া ভাল কর নাই। যে বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া, বিশ্বেশ্বরকে দেখ নাই, সেটি তোমার ভ্রম বিশ্বাস। তুমি হয়ত দোপাটি ফুল দেখিয়া থাকিবে; জান ত তাহার একটি বৃন্ত চ্যুত হইলেও অন্য বৃন্তে ফুলটি আকৃষ্ট থাকে। ইন্দুমতী আর তোমার সম্পর্ক কেবল এ জগতের নহে— পরজন্মেরও। কেহই কাহাকে ছাড়িতে পারিবে না। এটী নিশ্চয়, জানিও।

তাইবলি, ভাই, কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া, বিশ্বেশ্বরকে দেখিতে যাইও, বাসনা পূরিবে। এখনও সম্পূর্ণই আছ; জানি, ভালবাসা পরিপূরিত চক্ষু চিরকাল রোগগ্রস্ত। জগতে যত কেন সুন্দর ও প্রীতিপ্রদ বস্তু থাকুক না, ভালবাসার পাত্র ব্যতীত, সেই চক্ষু অন্য কিছুই সুন্দর দেখিতে পায় না। অতএব, ইন্দুমতী ভিন্ন অন্য কেহ, তোমার চক্ষু-রোগের প্রতিকার করিতে পারিবে না। তোমার নিমিত্ত, তোমার পিতা মাতা জীবন্মৃত! তাঁহাদের প্রাণে কষ্ট দেওয়া উচিত কি?

যাহাহউক, কিছু অর্থ পাঠাইব কি? সঙ্গে পাথেয় থাকা ভাল। জান ত, পথে কত আপদ বিপদ আছে। শরীর সুস্থ রাখিতে বিশেষ যত্ন করিও। অসুস্থ হইয়া পড়িলে, অভিলষিত কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মিবে। রায়মহাশয়, তোমাকে ও ইন্দুমতীকে খুঁজিতে দেশে বিদেশে লোক পাঠাইয়াছেন। আমরা তোমার বিরহে কাতর। সর্ব্বদা শারীরিক কুশল লিখিতে ভুলিও না।

তোমারি—

তারাকান্ত।"

তারাকান্ত পত্র লিখিয়াই ডাকে পাঠাইল, এবং রায়বাড়ীতে পত্রের বিষয় বলিয়া একবারে কাশীতে চলিয়া গেল। পত্রের ভিতরে কাশী যাওয়ার সংবাদ লিখিল না। কারণ, সে সংবাদ জানিতে পারিলে, হয়ত নরেন্দ্রনাথ অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে।

যথাসময়ে পত্রোত্তর আসিল। পত্র পাইয়া নরেন্দ্রনাথ কিছু ভাবনায় পড়িল। পরে, উত্তর লিখিল যে টাকাকড়ি কিছুই

পাঠাইও না। অর্থই অনর্থের মূল। পিতা মাতার আমি কুসন্তান; তাহাদিগকে সুখী ও তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতে পারিলাম না। তুমিই তাঁহাদের যত্ন করিও। আমার নিকট আর পত্র লিখিও না। শীঘ্রই আমি স্থানান্তরে যাইব।

এই পত্রও তারাকান্তের বাড়ীতে আসিল। কিন্তু সে বাড়ীতে নাই বলিয়া, পত্রখানা রায়বাড়ীতে দেওয়া হইল। পত্র পাইয়া রায়মহাশয়, নূতন চিন্তায় বিজড়িত হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

—০০(ঃ)০০—

নিমজ্জন।

ইন্দুমতী চলিয়া গিয়াছে—আছে শোক—আছে অবসাদ, কায়া চলিয়া গিয়াছে—আছে মাত্র ছায়া; কায়ার অবসানের সহিত জীবনের সুখ শান্তি, সরস বসন্ত সকলি ঝরিয়া যায়। ছায়া—চিন্তার কোলে আশ্রয় পাইয়া বাড়িতেছে—হাহাকার করিতেছে। অগ্রে যাহা নরেন্দ্রনাথ দেখে নাই, ভাবে নাই আজ তাহা দেখিল—ভাবিল। এখন ইন্দুমতীতে নিত্য কত নূতন মাধুরী, কত সুকুমার ভাবের ফোয়ারা দেখিতে লাগিল। এ ইন্দু যেন সেই ইন্দু নহে—এ যেন স্বর্গের বিভব! কেন সন্দেহের বশীভূত হইলাম? কেন আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিলাম? আমার কি না ছিল? প্রেম, প্রীতি, করুণা, হাসি খুসি, সুখ শান্তি কি না ছিল? আমার ইন্দু আমার পুণ্যের পুরী; স্নেহের শতদল; সতীত্বের শ্বেতস্তম্ভ! কেন কলঙ্ক ঢালিয়া দিলাম? স্তম্ভ বুঝি ভাঙ্গিয়া গেল,—পদ্ম বুঝি ঝরিয়া গেল? আহা! স্তম্ভের গাত্রে কেমন প্রেমের সেই পুষ্পিত লতাটি জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিতেছিল; কেমন সেই ফুটন্ত ফুল! কেমন সে ফুলের হাসি—কেমন গন্ধ—কেমন কান্তি!! আমি কীট—নরকের কীট; ফুলের বুকে বিষদংশন করিলাম.

কোমল কুসুমটী ম্লান হইয়া ঝরিয়া পড়িল। আর আমি, মরমে মরিলাম!

নরেন্দ্রনাথের সেই কথা, সেই কার্য্য। তারাকান্তকে পত্র লিখিয়াই, কাশী ছাড়িল। কাশী ছাড়িয়া, স্থানে স্থানে ইন্দুমতীর অন্বেষণ করিতে লাগিল। অহর্নিশ ইন্দুমতীর চিন্তা ভাবনায় নরেন্দ্রনাথের শরীর অত্যন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িল। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার শক্তি বিলুপ্ত প্রায় হইল। শেষ এমন হইল যে নরেন্দ্রনাথকে কেহ খাইতে দিলে খায়; নতুবা অনাহারে দিন যাপন করিয়া থাকে। অনাহারে অনিদ্রায়, দেহের এত পরিবর্ত্তন ঘটিল যে, নরেন্দ্রকে আর নরেন্দ্র বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। প্রতিনিয়ত সেই এক ভাবনা ও চিন্তা—ইন্দুমতী। কোথায় গেলে ইন্দুমতীকে পাইব—কেমনে পাইব। কে ইন্দুমতীর সংবাদ দিবে? কেবল এই ভাবনাই সার ও জপতপ হইল। নরেন্দ্রনাথ ঘাটে পথে, মাঠে, যেখানে সেখানে বসিয়া বসিয়া, আরও কি জানি কি বিড় বিড় করিয়া ভাবিতে থাকে। সম্মুখে লোকজন দেখিলেই হাসিয়া উঠিয়া যায়। তখন নরেন্দ্রনাথকে যে দেখে, সেই বলে, লোকটী হয় উন্মত্ত, না হয় শীঘ্রই উন্মত্ত হইবে। প্রকৃতপক্ষেই, এখন নরেন্দ্রনাথের চিত্ত বড়ই চঞ্চল; উদাস উদাস—কেমন কেমন ভাব হইয়াছে।

এই ভাবে নরেন্দ্রনাথ, ইন্দুমতীর অন্বেষণার্থ হাটিয়া হাটিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। কিন্তু ইন্দুমতীকে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না।

আষাঢ় মাস—শেষ ভাগ। সকাল হইতে দুপুর পর্য্যন্ত অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তারপর, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে জগৎ বিদগ্ধ হইতেছে। রাস্তা ঘাট কর্দ্দমাক্ত। চলিবার পক্ষে বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন সময়, নরেন্দ্রনাথ ঘুরিতে ঘুরিতে একটী শ্মশানে আসিয়া উপনীত হইল। দেখিল, শ্মশানে রাশি রাশি অঙ্গার চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত। কত ভগ্ন, কত অর্দ্ধ ভগ্ন মৃণ্ময় কলসী গড়াগড়ি যাইতেছে—ইয়ত্তা নাই। কোন কোনটির ভিতরে বায়ু প্রবিষ্ট হওয়াতে শোঁ শোঁ শব্দ হইতেছে। আবার শ্মশানময় রাশি রাশি অস্থি-কপাল-কঙ্কাল। চুল্লিগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কেবল কড়িগুলি বিকট দন্ত বিকাশ করিয়া প্রচার করিতেছে—এই ত্রিতাপ পরিপূরিত সংসার অসার ও অলীক; ধন জন যৌবন ক্ষণভঙ্গুর; গর্ব্ব অভিমান; হিংসা দ্বেষ; পরপীড়নও পরশ্রীকাত ... ... ন্যায় সময়ের আবর্ত্তনে কখনও সংযুক্ত; কখনও বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত! আরও দেখিল, শ্মশানের মাঝখানে একটী মৃত কুকুর। কুকুরটীর নাসিকা ও মুখ বিনির্গত শোণিতে দুই একটী স্থান সুরঞ্জিত। তার স্থানে স্থানে তুলসীবৃক্ষ অতীতের সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নরেন্দ্র, তুলসীগাছগুলি দেখিয়া ভাবিল, তুলসী, মা, তুমি শ্মশানবক্ষে কেন? এই জগতে তোর কি মা আর থাকিবার স্থান নাই? মা, তোকে এখানে দেখিলে, কত ক্লেশের—কত যাতনার ও কত ব্যথার কথাই যে মনে পড়ে, তাহা আর কি বলিব? সে কথার ইয়ত্তা নাই—সংখ্যা নাই। অসংখ্য। মা, তোকে শ্মশানে দেখিলেই পাঁজর ভাঙ্গিয়া হু হু করিয়া শোক সাগর উদ্বেলিত হয়; অতীতের সুখস্মৃতি বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় হৃদয়ে অনন্ত যাতনা

দেয়,—দেহ প্রাণ শিহরিয়া উঠে। মা, তবে তুমি শ্মশানে কেন? বুঝেছি,—তুমি জগৎ-জননী। মা কি, সন্তানের ক্লেশ সহিতে ও সন্তান ছাড়িয়া থাকিতে পারেন? তাই বুঝি, মা, তুই সন্তানের কল্যাণার্থ ও সন্তানের মুখকমল দেখিবার জন্য শ্মশানে বিরাজমানা। আর তাই বুঝি, মা প্রতিদিন প্রভাতে ব্যাকুল প্রাণে কাঁদিস্। আর টস্ টস্ করে অবিশ্রান্ত চোখের জল ফেলিস্!

ভারতের এই মহাকাব্যের দৃশ্য ও চিত্র অন্যত্র নাই।

শ্মশানের অনতিদূরে নদী। নদীতে খরস্রোত প্রবাহিত। ভীষণ ও প্রবল আবর্ত্তে নদীর পার ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া হুড় হুড় ঝুড় ঝুড় করিয়া পড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষাবলীও ঝুপ ঝাপ পড়িতেছে; পড়িয়াই ডুবিয়া যাইতেছে। কেবল দুই একটী কদলী বৃক্ষ শির তুলিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া যাইতেছে। আবার কোথাও কেহ বাড়ীঘর ভাঙ্গিতেছে; কেহ তৈজস পত্র নৌকায় তুলিতেছে; কেহবা ঐ সমস্ত জিনিস স্থানান্তরে লইয়া যাইতেছে। কোন কোন স্থানে বড় বড় প্রাসাদ চিরতরে নদীগর্ভে বিলীন হইতেছে। কোথাওবা ভগ্ন প্রাসাদের কিয়দংশ পূর্ব্ব স্মৃতির চিহ্নস্বরূপ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই সকল দেখিতে দলে দলে লোক নদীর পারে আসিতেছে—যাইতেছে। আবার দল বাঁধিয়া স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে।

সেই নদীর ধারেই শ্মশান। শ্মশানের সন্নিকটে ছেলেরা খেলা করিতেছিল। শ্মশানে নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া বালকগণ খেলা ফেলিয়া নরেন্দ্রনাথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং নরেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

নরেন্দ্রনাথ তখন ছোট ছোট বালকগণকে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "কি হে? তোমরা এ ভাবে চেয়ে রৈলে যে?"

বালকগণের মধ্যে যে বয়স্ক, সে বলিল,

"আপনাকে একটা কথা ব'লতে এসেছি।"

নরেন্দ্রনাথ, সাগ্রহে বলিল, "কি কথা, বাবা, বল?"

বালকগন। আপনি কি জানেন না, যে এই শ্মশানে একটা প্রকাণ্ড ব্রহ্মদৈত্ত্য থাকে? এখানে দিন দুপুরে, কি রাত্রিতে কেহ একাকী আসিলে ঘাড় ভাঙ্গিয়ে মারিয়া ফেলে। সন্ধ্যা হ'ল যে। আপনি শীগ্‌গির পালান—শীগ্‌গির পালান। এই দেখুন, আমরাও চ'লে যাচ্ছি।

এই বলিয়াই, বালকগণ মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না করিয়া সশব্দে দৌড়াইয়া যে যাহার বাড়ী অভিমুখে প্রস্থান করিল। বস্তুতই, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সেইসময় নরেন্দ্রনাথ উদ্ভ্রান্ত মানসে ভাবিল, হে ভগবন! সকলে তোমাকে দয়াময় ও পতিতপাবন বলিয়া থাকে। কিন্তু, আমি ত তোমার দয়ার কিছু মাত্রও লক্ষণ দেখিতেছি না। আজ এই বালকদের মধ্যে যে দয়া, যে করুণা, যে প্রীতি ও যে অনুরাগ দেখিলাম, তাহার বিন্দুমাত্রও তোমাতে নাই। অথচ লোকে বলে, তুমি দয়ালের শিরোমণি! আমি বলি, তুমি নিতান্ত নিষ্ঠুর—নির্দ্দয়! তোমাকে যে দয়াময় বলে, বোধ হয়, সে আরও নিষ্ঠুর!! পাষাণে কর্দ্দম নাস্তি। তবে আর তোমায় ডাকিব কেন? নির্দ্দয়কে ডাকিয়া লাভ কি? বরং না ডাকিলে সুখ শান্তি আছে। কেবল তোমার সত্তা ভাবিলেই নানা প্রকার ভয়ের উদ্রেক হয়। যদি তোমার সত্তাই না ভাবি, তবে আর ভয় কি? তাই বলি, তোমাকে ডাকিতে গেলেই

যত কষ্ট,—যত লাঞ্ছনা গঞ্জনা। অনন্ত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও যদি তোমাকে পাওয়া যাইত, তবু না হয় ডাকিতাম। কিন্তু, যাঁহাকে, ডাকিতে ডাকিতে প্রাণ গেলেও—এমন কি জন্ম জন্মান্তর ভরিয়া ডাকিলেও যাঁহার সহজে দয়া হয় না, বল দেখি, এমন পাষাণকে কে ডাকে? তবে, যে দুই একবার ডাকি, সে কেবল যমরাজার ভয়ে; সে নাকি বড় ভয়ঙ্কর অথচ বৈষ্ণবচূড়ামণি! যে এত বড় ভয়ঙ্কর, সে কি প্রকার বৈষ্ণব? বৈষ্ণবের সদাই সখ্য ও মধুর ভাব। কিন্তু ইহার কেবলই কঠোরতা ও নির্ম্মমতা। আবার ইহার পারিষদগুলি আরও নির্দ্দয়। নাথ, আমি তোমাকে বেশ চিনিয়াছি; তুমি কাকের উপর কামানের চোট ছাড়িতে খুব মজবুত! তাই ত, ক্ষুদ্রকে যে সংহার না করিল, তাহার মহত্ত্ব কোথায়?

হে দীনবন্ধু! আমার পাপ এখনও খণ্ডন হয় নাই কি? পিপীলিকা ক্ষুদ্র প্রাণী, তাহার দংশনে, বলবান মনুষ্যও শিহরিয়া উঠে। নাথ আমি ত তোমার নিকট ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, আমার আর্ত্তনাদ কি তোমার শ্রুতিগোচর হয় না? তুমি কি আমার এ দুঃখ কষ্ট দেখিতে পাও না? তোমার চক্ষু, কর্ণ নাই কি? তা হইলেও এক আপদ যাইত। আর কেহ তোমায় ডাকিত না! কিন্তু, তোমাকে যে অর্জ্জুন বলিয়াছেন,—

"অনেক বাহূদরবক্ত্র নেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপং।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥"

তবে সে কথা কি মিথ্যা?

" তাই, বলিতেছিলাম যে, তোমার রাজ্যে সুবিচার ও সুশৃঙ্খলা নাই। যাঁহার এত বড় সাম্রাজ্য, তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধি খুব প্রখর হওয়া উচিত। তোমার তত বড় বুদ্ধি শুদ্ধি থাকিলে ত! তুমি রাজার অনুপযুক্ত!! তাই,' এখান হইতেই করযোড়ে তোমাকে প্রণিপাত করিতেছি; আর প্রার্থনা করিতেছি, যে এরূপ রাজ্যে আর আমাদিগকে পাঠাইও না। পাঠাইয়া জ্বালাইয়া পোড়াইয়া মারিও না।

এই সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া, নরেন্দ্রনাথ শ্মশান হইতে চলিয়া আসিল। এবং নদীর ভাঙ্গন কূল দিয়া চলিতে লাগিল। নদীতে পড়িয়া যাইবার ভয়ে কেহই নদীর ভাঙ্গন কূল দিয়া চলে না; এমন কি পারেও যায় না। দর্শকেরা কোন আগন্তুককে ভাঙ্গন কূল দিয়া যাইতে কি চলিতে দেখিলে, অমনি নিবারণ করিয়া থাকে। নরেন্দ্রনাথকেও ভাঙ্গন কূল দিয়া যাইতে দেখিয়া নিষেধ করিল। নরেন্দ্র কিন্তু কাহার নিষেধ মানিল না—শুনিল না। যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে সহসা পার ভাঙ্গিয়া নদীতে পড়িয়া গেল। দর্শকেদের মধ্যে কেহ কেহ নরেন্দ্রনাথকে নদী হইতে তুলিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছিল। কিন্তু নদীর প্রবল স্রোতে ও আবর্ত্তে নরেন্দ্রনাথ পড়িয়াই কোথায় ডুবিয়া গেল—আর কেহ দেখিতে পাইল না।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—[০]—

আশ্রয়ে।

উষা বড় সোহাগী মেয়ে। শুকতারা ওকে খুব ভালবাসে। সারা রাত জননীর রূপকথা শুনিয়া শুনিয়া, এখন একটু ঘুমিয়েছে। উষাকে জাগান বড় কষ্টকর ব্যাপার। এই সবে চোখের পাতা ছুটি পড়িয়াছে।

শুকতারার স্বামী বড় শান্ত শুদ্ধ। তার ঘর কন্নাটিও বড় সুখের। নিজের কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে। কিন্তু, সে করদ রাজা। তাঁহার সৈন্য সামন্ত গুলিও বড় শিষ্টাচারী—বড় প্রভুভক্ত। এখন প্রভু বিষয় কার্য্যে চলিয়াছেন; সেনাগুলিও তাঁহার পিছু পিছু ছুটিয়াছে। শশাঙ্করাজ, এবার মনে মনে ঠিক করিয়াছেন যে, চাকুরি করিয়া যে দু'দশ টাকা পাইবেন, তাহা দিয়াই এক প্রকার সংসার চালাইবেন। রোজ রোজ আর সেই দুর্দ্দান্ত রবি রাজার পীড়ন সহিতে পারিবেন না। করদ রাজা, আর কয়েদী উভয়েই সমান!

এই ভাবিয়া, রজনীরঞ্জন রায়, নক্ষত্রসেনা সমভিব্যাহারে বিদেশে যাত্রা করিলেন। শুকতারা ম্লান বদনে চাহিয়া আছে। বিদায় কালে, চারি চক্ষু মিলিত হওয়াতে, কত যে অশ্রুবিন্দু,

ভূমিতল অভিষিক্ত করিল—ইয়ত্তা নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে শশাঙ্ক বিদায় হইলেন। শুকতারা কিন্তু তখনও নীরবে চাহিয়া রহিল।

এদিকে একটা সাড়া শব্দ পড়িয়া গেল। বিহগকুল উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "উষা জাগো, উষা জাগো; এখনি রবি আসিয়া সবংশে জ্বালাইয়া মারিবে। উষা জাগো।" শুক কাঁদিয়া বলিল, "অভাগীর মেয়ে তোর কি আজ ঘুম ভাঙ্গিবে না? ভাবিয়াছিলাম যে, নভ নগরেই তোকে বিয়ে দিব; কিন্তু তা হ'বার যো নাই, সবাই বলে, ওকে নিয়া ঘর কন্না হইবে না, কি করি? এখনও যে, তোর চপলতা গেল না! শিশিরের জলে চোখ দুটি ঝীগ্‌গির ঝীগ্‌গির ধুয়ে আয়। গাছে গাছে ফুল ফুটেছে। আজ তোকে কুসুম ভূষণে সাজাইয়া দিব—আয় উষা, আয়।" উষা তখন ধীরে চোখ দুটি মাজিল। ঘুমের ঝোঁকে এখনও কোয়াশা কোয়াশা দেখিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে উষাকে, শুক একখানি কোমল গোলাপী বসন পরাইয়া দিল এবং ফুলের চুল, ফুলের মালা ফুলের বালা দিয়া, উষার সোণার অঙ্গ সাজাইয়া দিল। উষা, এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

শুকের একটী সতীন আছে। নাম—কুমুদিনী। শুক, উষাকে বেশ ভূষায় সুসজ্জিত করিয়া সতীনের নিকট পাঠাইয়া দিল এবং নিজেও প্রস্থান করিল। একটা সোণার মেঘে চড়িয়া, উষা, ধীরে —অতি ধীরে মর্ত্তে নামিতে লাগিল। কুমুদিনী, উষাকে দেখিয়াই ত তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিল। উষার সাজ সজ্জা দেখিয়া অবাক! এ যে বিয়ের সাজ। কুমুদিনী বলিল, "পোড়ামুখী, আমার বাড়ী

তোর জায়গা হইবে না। সূর্য্য একেই আমার বংশের উপর হাড়ে হাড়ে চটা। এখানে তোকে দেখিলে কি আর রক্ষা আছে?" উষা, গোলাপী নেশায় বিভোর হইয়া, গভীর হাসিতে লাগিল। কুমুদিনীর কথায় ভ্রূক্ষেপও করিল না।

কুমুদিনী মনে মনে ভাবিল, আকাশে ওর বিয়ে হবার যো নাই; কাজেই এখানে আদর জানাতে আসিয়াছে। ও যেমন ঘুমালু মেয়ে, ওকে তেমনি একটা ঘুমালুর কাছে বিয়ে দিতে হইবে। কুম্ভকর্ণ কি মরিয়াছে? যাহোক, একটা ঘটক যোগাড় করা চাই। কুমুদিনী, ঘটক খুঁজিতে থাকুক। পাঠক, আসুন, আমরা এই অবসরে ইন্দুমতী ও শৈলবালাকে দেখিয়া আসি। উষার বিয়ের সময় আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করাইব। তা বলে, আপনারা এখন হইতেই উপবাসী থাকিবেন না। আসুন, আর ওখানে থাকিবেন না।

সেই সুন্দর উষার সময়, ইন্দুমতী নিজের পরিধেয় বসনে, চুলে, সর্ব্বাঙ্গে ধূলা মাখিতে লাগিল। ভয়,—পাছে প্রভাতে কেহ তাহার লাবণ্য দেখিয়া, কোন প্রকার অহিতাচরণ করে। কিন্তু, মাটি মাখিলে কি হইবে? ইন্দুমতীর লাবণ্য বিভা, স্ফটিক পাত্র বিনির্গত আলোর ন্যায়, মাটি ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। শৈলবালা, এ সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে মনে বড়ই হাসিতে ছিল। পরে, প্রকাশ্যে কহিল,

"সই, এ কি করিতেছ? সোণার অঙ্গ কি মাটিতে ঢাকে?"

ইন্দুমতী বিরক্তি প্রকাশ করিল।

শৈলবালা, ইন্দুমতীর বিরক্তি বুঝিতে পারিল। বুঝিয়াই আর

কোন কথা বলিল না। কেবল এইটি মনে মনে ঠিক করিল, যে সময় পাইলে, একদিন এ সমস্ত কথা বলিবে—বলিয়া হাসিবে—হাসাইবে।

ইন্দুমতীর খেলা মাথা শেষ হইল। তখন উভয়ে পথ ধরিল। প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত চলিল। পথে যে ইন্দুমতীকে দেখিল, সেই ভ্রূকুঞ্চিত করিল। ঠিক সন্ধ্যায় সন্ধ্যায়, তাহারা একটী গ্রামে আসিয়া পৌছিল। গ্রামখানা ক্ষুদ্র; লোক জন বেশী নাই। লোক জন না থাকিলেও, গ্রামখানা বড়ই সুন্দর! প্রাকৃতিক শোভায় গ্রামে যেন চিরবসন্ত বিরাজমান। ইন্দুমতী ও শৈলবালা গ্রামে পৌছিয়াই ত বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথায়ও থাকিবার স্থান পাইল না। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, বাসস্থানের দুর্গতি দেখিয়া, ইন্দুমতীর চোখে জল আসিল এবং, পথ-ক্লেশে অত্যন্ত কাতরা ও বিষণ্ণা হইয়া পড়িল। কিন্তু, মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিল না। মনের কষ্ট মনেই চাপা দিয়া রাখিল। শৈলবালা, ইন্দুমতীর কাতরতা বুঝিতে পারিল। ইন্দুমতীর কষ্টে শৈলবালার চোখে জল আসিল।

রাত্রি চারি ছয় দণ্ড হইয়াছে। চাঁদ ধীরে ধীরে উঠিতেছিল। তখনও ইন্দুমতী ও শৈলবালা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পরে, তাহাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল,—ঘুরিতে, ঘুরিতে, একটি ক্ষুদ্র বাড়ীতে উঠিল। সেই বাড়ীতে মাত্র দুখানা খড়ের ঘর। পূর্ব্বে যে আরও দুই একখানা ঘর ছিল, এখনও তাহার নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। পাকের ঘরের চালে প্রায়ই খড় নাই; অতি অল্প মাত্র

রহিয়াছে। বোধহয়, তাহাও অতি সামান্য বাতাস হইলেই উড়িয়া যাইবে এবং ঘরের প্রায় সকল বেড়াই খসিয়া পড়িতেছে। কেবল কঞ্চিগুলি একে অন্যের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। রান্না ঘরটি ধূমে মসীরূপী হইয়াছে। বাড়ীর চারিদিকে, বড় বড় আম নারিকেল, খেজুর, তাল, সুপারি ও জাম প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী। সেই বাড়ীতে মাত্র দুটি লোক বাস করিয়া থাকে। উভয়েই আবার স্ত্রীলোক। একটি ক্ষুণক্ষুণে বৃদ্ধা; অপরটি শৈলবালার সমবয়স্কা। নাম—মাধুরী। মাধুরী, অনিন্দ্য সুন্দরী; বৃদ্ধা—মাধুরীর ঠাকুর মা। বৃদ্ধাটি শয়ন ঘরের বারন্দায় বসিয়া পান ছেঁচিতেছিল। দন্তাভাবে পান চিবাইয়া খাইতে পারে না। পান ছেঁচিতে ছেঁচিতে ডাকিল,

"ও মাধুরী, ও মাধুরী, খেয়েছিস্?"

রান্নাঘর হইতে, মাধুরী উত্তর করিল,

"খেতে ব'সেছি। তুমি ঘুমোও গে না।"

বৃদ্ধাকে খাওয়াইয়া, মাধুরী নিজে খাইতে বসিয়াছে।

বৃদ্ধা, পুনরায় কহিল,

"তুই, একাকী ঘাটে যেতে পারবি?"

মাধুরী, ভাতের গ্রাস মুখে দিয়া বলিল,

"পা-রি-ব।"

ঘাট, বাড়ীর সংলগ্ন।

বৃদ্ধা তখন শয়নার্থ চলিল। সেই সময়, শৈলবালা কহিল,

"আমরা দুটি স্ত্রীলোক; আপনাদের বাড়ীতে থাকিতে পারিব কি?"

বৃদ্ধা, মাথা নাড়িতে নাড়িতে, গৃহের ভিতরে যাইতেছিল। শৈলবালার কথা শুনিয়া, ফিরিয়া চাহিল। বলিল,

"এখানে কোন জায়গা টায়গা হবে না, গো। অন্য বাড়ীতে

এই বলিয়া, বৃদ্ধা গৃহের ভিতরে চলিয়া গেল।

বৃদ্ধার কথা শ্রবণ করিয়া, ইন্দুমতী ও শৈলবালা ফিরিয়া চলিল। কিন্তু পিছন হইতে, মাধুরী কহিল,

"যেয়ো না—যেয়ো না; বসো।"

এ কথায় ইন্দুমতী ও শৈলবালা, হাতে যেন আকাশ পাইল এবং তাহাদের প্রাণে প্রাণ আসিল; আর ফিরিতে হইল না। মাধুরীর পাতে কয়টা ভাত ছিল। সেগুলি মাধুরী আর খাইল না। তাড়াতাড়ি হাতমুখ প্রক্ষালন করিয়া ইন্দুমতীর সম্মুখে আসিল। বলিল,

"তোমাদের বাড়ী কোথা, গো?"

শৈলবালা। মুকুলপুরের নিকট।

হাসিকান্নার অতি সন্নিকট মুকুলপুর গ্রাম। শৈলবালা, গ্রামের প্রকৃত নাম প্রচ্ছন্ন রাখিল। মাধুরী, তাহাই বিশ্বাস করিয়া কহিল,

"এ গ্রামে এসেছ কেন?"

শৈলবালা, কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া আকুল হইল। পরে, বলিল,

"ভিক্ষা করিতে।"

মাধুরী, অত্যন্ত বিস্মিতা হইল। বলিল,

"তোমাদের গ্রামে কি ভিক্ষা মিলে না? তোমরা কি ভিক্ষা করে খাও?"

শৈলবালা। মিলিবে না কেন? কম আর বেশী।

মনে মনে বলিল, "আমাদের গ্রামে মিলে সবই; কেবল মিলে না—দয়া।"

ইন্দুমতী, একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। বলিল,

"বোন, আজ আমরা কদিন যাবৎ ভিখারিণী হইয়াছি।"

মাধুরী তখন ইন্দুমতীর গলা জড়াইয়া ধরিল। কেন যে ধরিল, বলিতে পারি না। বোধহয়, মাধুরীর প্রাণে ইন্দুমতীর কথায় বিশেষ কোন আঘাত লাগিয়াছিল। তাই, মাধুরী, বাষ্পাকুলিতলোচনে, গদ্ গদ্ ভাবে কহিল,

"এসো বোন, ঘরে এসো। এযে তোমাদেরই বাড়ী ঘর। বোন, আমরাও ভিক্ষা করেই খেয়ে থাকি। এখন তোমাদিগকে কি করে খাওয়াব? যা ভিক্ষায় পেয়েছিলুম, তা ত আজ দু'বেলায় খেয়েছি। ঘরে যে আর এক মুষ্টি চালও নেই।"

এই বলিতে বলিতে মাধুরী, ইন্দুমতীর হাত ধরিয়া ঘরের ভিতরে লইয়া চলিল। ইন্দুমতী দেখিল, মাধুরীর আয়তলোচন যুগলে তখন প্রবল অশ্রুধারা বহিতেছে। মাধুরীর অপূর্ব্ব ও অলৌকিক সুজনতা দেখিয়া বিমোহিতা হইল। মনে মনে ভাবিল, একদিন নরেন্দ্রনাথের শ্রীমুখে একটী অমৃতময় কথা শুনিয়াছিলাম, "বিষে বিষ; জলে জল; অনলে অনল মিশিয়া থাকে। সে অনন্ত সুখ—অনন্ত শান্তি।" তাঁহার সেই বেদবাক্য, সমানে সমানের সংযোগ, স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া ধন্য হইলাম। আজ মাধুরীর ও আমাদের একই অবস্থা, তাই, মাধুরীর চোখে এত জল! ইচ্ছা হয়, মাধুরীর পায়ে

"মাধুরী তখন ইন্দুমতীর গলা জড়াইয়া ধরিল।" ১৩৮ পৃষ্ঠা।

বিলাই। এমন রত্ন পাইলে কে না বিকায়, ইন্দু! ভগবানই বিকান, তুমি আমি ত ছার!

মাধুরী, ইন্দুমতী ও শৈলবালাকে, ঘরের ভিতরে লইয়া গিয়া বসিতে জায়গা দিল। ইন্দুমতী তখন প্রদীপের আলোতে মাধুরীর রূপটি দেখিয়া আবার ভাবিল, মাধুরীর কি সুন্দর গঠন—কি অনুপম লাবণ্য। যেন শিশির স্নাত প্রসূনটী। দেহের যেমন অনুপম লাবণ্য, কথাগুলিও তেমনি সুমধুর—কেমন যেন স্নেহমাখা। আর প্রাণটি ত দেব-আরাধ্য! প্রকাশ্যে কহিল,

"বোন, আমরা খাব না। তোমার ভয় নেই।"

মাধুরীর বিলম্ব দেখিয়া, বৃদ্ধা উপর্য্যপরি ডাকিতেছিল। মাধুরী, ছুটিয়া বৃদ্ধার নিকট গেল এবং কাণে কাণে কি কথা বলিল। বোধহয়, ইন্দুমতীদের থাকিবার কথাই অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল। বলিয়াই ছুটিয়া আবার ইন্দুমতীর নিকট আসিল।

ইন্দুমতী ও শৈলবালা স্নানার্থ ঘাটে চলিল। সমস্ত দিন স্নান হয় নাই। মাধুরী, সেই অবসরে সরিয়া পড়িল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

মাধুরীর প্রয়াণ।

মাধুরী, শৈল ও ইন্দুকে ঘাটে রাখিয়া, গ্রামের ভিতরে চলিল। রাত্রি প্রায় দেড়প্রহর, অতীত হইয়াছে। চাঁদ উঠিয়াছে। জগত, পরিষ্কার জোৎস্নাময়। রাস্তাতে কোনও ভয় নাই; মাধুরী নির্ভয়ে চলিতে লাগিল। রাস্তাটী বড়ই মনোরম। রাস্তার উভয় পার্শ্বে, সারি সারি বট, অশ্বথ, ঝাউ, দেবদারু, নিম ও বাবলা প্রভৃতি বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধরূপে বিরাজ করিতেছে। কোন কোন বৃক্ষে ঝিঁঝিঁর দল সমস্বরে ডাকিতেছিল; পাখীর পক্ষ বিলোড়ন শব্দ হইতেছিল। মাধুরী [illegible] পথ হাঁটিয়া, একটী বাড়ীতে উঠিল। বাড়ীর ভিতরে গেল। ডাকিল,

"মা, মা, আমি মাধুরী এসেছি। উঠে দুটো কথা শুন, মা।"

মাধুরীর ডাকে, সেই বাড়ীর গৃহিণী উঠিলেন। তিনি মাধুরীকে কন্যাসম আদর করিয়া থাকেন। যেহেতু, গৃহিণীর কন্যা সন্তান নাই। মাধুরীও গৃহিণীকে মাতৃতুল্য ভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকে। গিন্নী, বলিলেন,

"কি, গো মাধুরী; এত রাত্তিতে কোথা থেকে? তোর কি ভয় নেই, মা?"

মাধুরী, সাহসের সহিত কহিল,

"ভয় কি, মা?"

গিন্নী, আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন,

"বলিস্ কি, মাধুরী, ভয় নেই? ভয় না থাকিলেও কি এত রাত্রিতে আসিতে আছে?"

মাধুরী, নম্রভাবে কহিল,

"প্রয়োজন আছে বলেই এসেছি, মা।"

গিন্নী। কাল এলে হ'ত না, মা?

মাধুরী। বিশেষ প্রয়োজন—

গিন্নীর হৃদয়ে বাৎসল্যভাবের উদ্রেক হইল। কহিলেন,

"তোমার এমন কি প্রয়োজন, মা?"

মাধুরীও গিন্নীর বাৎসল্যবাক্যে ভুলিয়া গেল। কহিল,

"মা, বাড়ীতে দুটি আত্মীয় এসেছেন। তাঁরা কি খাবেন? খাবার তো কিছু নেই, মা? ভিক্ষায় যা পেয়েছিলুম, তা দুবেলায় খেয়েছি। ঘরে আর একমুঠা চালও নেই? এখন উপায় কি, মা?"

এই বলিয়া ছল্ ছল্ নেত্রে, গিন্নীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। গিন্নী হাসিয়া বলিলেন,

"পাগলি তার জন্য ভাবনা কি? দাঁড়াও চাল ডাল দিচ্ছি।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে, গিন্নী একটি সাজিতে করিয়া প্রায় পাঁচ সের চাল ডাল আনিয়া দিলেন। গিন্নী, মাধুরীর কোন অভাব জানিতে পারিলেই, তৎক্ষণাৎ, তাহা বিমোচনার্থ যত্ন করিয়া থাকেন। মাধুরীকে ভিক্ষা করিতেও নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু, মাধুরী লজ্জাবশত

রোজ রোজ গিন্নীর নিকট খাবার চাহিতে আসে না।

চাল ডাল নিয়া, মাধুরী দ্রুতপদে বাড়ী আসিল। বাড়ীতে আসিয়া দেখিল, ইন্দু ও শৈল ঘাটে বসিয়া স্নান করিতেছে এবং স্নান করিতে করিতে কি কথোপকথন করিতেছে। ইহা দেখিয়া, মাধুরী, তাড়াতাড়ি পাক করিতে আরম্ভ করিল। ইন্দু ও শৈল, মাধুরীর এসব ঘটনার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না। ইন্দু ও শৈল, স্নানান্তে বাড়ী আসিয়া, মাধুরীকে ডাকিল। মাধুরী, রান্নাঘর হইতে সহর্ষে কহিল,

"আমি রান্না করিতে বসেছি; তোমরা ঘরে বসো, বোন।"

মাধুরীর মন আনন্দ সাগরে ভাসিতেছিল। কেন মাধুরীর এত হর্ষ, কে বলিবে? এত যে পরিশ্রম, এত যে ক্লেশ, তবুও মাধুরীর শরীরে যেন উল্লাস ধরিতেছে না। আজ যেন তাহার বিলুপ্ত শক্তি, পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে। শৈলবালা, সৌজন্য প্রকাশ করিয়া কহিল,

"আমরা কিছু খাব না, বোন?"

মাধুরী, দুঃখিতভাবে কহিল,

"কেন খাবে না, বোন? আমি যে চাল ডাল এনেছি। অবশ্য খেতে হবে।"

শৈলবালা, ঈষৎ হাসিয়া কহিল,

"এই না বলিলে; চাল ডাল নেই?"

মাধুরী লজ্জিতা হইল। এবং সরল ভাবে কহিল,

"এখনি যোগাড় করেছি, বোন।"

শৈল। কোথায় পেলে?

মাধুরী। তা শুনে তোমাদের কাজ কি, বোন ?

তখন মাধুরী, উনুনে একখানা কাষ্ঠ গুঁজিয়া দিয়া, ইন্দুমতীর সন্নিধানে আসিয়া বসিল। কিয়ৎকাল বসিয়া ইন্দুমতীর হাত ধরিয়া রান্নাঘরে লইয়া গেল। পরে, বলিল,

"তোমার বুঝি খুব ক্ষুধা পেয়েছে, বোন? এই হ'ল আর কি। বেশী দেরী নেই।"

মাধুরী, আবার উনুনের কাষ্ঠখানা নাড়িয়া দিল। ভাত টক্‌বক্‌ করিতে লাগিল। ইন্দুমতী কহিল,

"না, আমার ক্ষুধা পায় নি।"

মাধুরী। না, কেন, বোন ? মুখখানিই ত শুষ্ক দেখা যাচ্চে।

মাধুরী, পুনরায় উনুনে কাঠ গুঁজিয়া দিল। কাঠগুলি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করিল। বলিল,

"আমি বুঝেছি; তুমি লজ্জায় কিছু বলিতেছ না।"

ইন্দু। লজ্জা কি? সত্যিই আমার ক্ষুধা নেই।

প্রকৃতপক্ষেই, ইন্দুমতীর হৃদয় সন্তাপানলে পুড়িয়া যাইতেছিল। কাজেই, এত বড় গুরুতর কষ্ট, যাহা জীবনে কখনও ঘটে নাই, সেই কষ্টে, ক্ষুধার জ্বালা বড় একটা অনুভব করিতে পারিতেছিল না। যাহাহউক, অতি সত্বর রান্না সমাপ্ত হইল। সকলেই যৎসামান্য আহার করিল। আহার করিয়া শয়নার্থ চলিল। শয়নকালে, মাধুরী, ইন্দুমতীকে বলিল,

"বোন্, আমি তোমায় পেয়েছি ?"

ইন্দুমতী, ঈষৎ হাসিল। কহিল,

"পেয়েছ।"

মাধুরী, আবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল,

"তোমাকে পেয়েছি।"

ইন্দুমতী, এবারও বলিল,

"পেয়েছ।"

মাধুরীর শরীর হর্ষে রোমাঞ্চিত হইল। বলিল

"বোন, তবে তোমাকে পেলেম?"

ইন্দু। পেলে।

ইন্দুমতীর কথা শুনিয়া, অমনি মাধুরী, ইন্দু
করিয়া চুম্বন করিল এবং উভয়ে গলাগলি করিয়া
স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রণয় অতি সহজেই ঘটিয়া থাকে

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

—•••—

কথোপকথন।

ইন্দুমতী ও মাধুরী বিরলে বসিয়া আছে। বসিয়া বসিয়া, কত কি কথোপকথন করিতেছে। ইন্দুমতী, মাধুরীকে সস্নেহে কহিল,

"বোন, আমায় একটী কথা বলিবে?"

মাধুরী, হাসিয়া কহিল,

"কি কথা, বোন?"

ইন্দু। যাই কেন হ'ক না; বলিবে কি না, বল?

মাধুরী। বলিব।

ইন্দু। বলিবে? কোন কথা ত গোপন করিবে না?

মাধুরী। না।

ইন্দু। সত্য?

মাধুরী। সত্য।

ইন্দু। তুমি নিত্য নিত্য রাত্রিরে কাঁদ কেন?

মাধুরী, রাত্রিতে ইন্দুমতীর পার্শ্বেই শয়ন করিয়া থাকে এবং শয়ন করিয়াই, উদ্বেলিত হৃদয়ে, নীরবে কাঁদিতে থাকে। ইন্দুমতী, অনেকদিন সেই নীরব ক্রন্দনের সাড়া পাইয়াছে

এবং ভাবিয়াছিল, যে এ ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিবে। কিন্তু, নির্জনে [illegible] যদি মাধুরী মনোভাব প্রকাশ না করে, তন্নিমিত্তই এতদিন জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই। অদ্য মাধুরীকে বিরলে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল। মাধুরী, ইন্দুমতীর কথা শ্রবণ করিয়া, তরল মেঘাবৃত নিষ্প্রভচন্দ্রের ন্যায় বিষণ্ণা ও মলিনা হইল এবং চকিতে বলিয়া উঠিল। বলিল,

"কৈ, না, বোন?"

ইন্দুমতী। ছি! আমার নিকট গোপন?

মাধুরী, লজ্জিতা হইল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল,

"বোন, আমি বড় দুঃখিনী। আমার দুঃখের পারাপার নেই।"

ইন্দুমতী, অবাক হইল। মনে মনে ভাবিল, জগতে আমার অপেক্ষা কি দুঃখিনী আছে? প্রকাশ্যে কহিল,

"কেন, বোন?"

মাধুরী কাতরে কহিল,

"স্বামী ব্যতীত স্ত্রীলোকের সুখ কি?"

ইন্দুমতী আগ্রহের সহিত কহিল,

"কেন? তোমার স্বামী কি নেই?"

মাধুরী, সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। এবং বর্ষার আকাশের মত আঁখি জলে ভরিয়া আসিল। কহিল,

"আছেন।"

ইন্দু। তবে তোমার দুঃখ কি?

মাধুরী, সবিষাদে কহিল,

'দুঃখ কি? বলিতে যে প্রাণ ফাটিয়া যায়!"

ইন্দুমতী দেখিল, মাধুরীর স্নেহস্নিগ্ধ আয়তলোচনে বারিবিন্দু উছলিয়া উঠিল। পরে, বলিল,

"বোন, তোমার দুঃখের কাহিনী কি শুনিতে পাব না? আমি কি তোমার কেউ নই?"

আদরে মাধুরীর আঁখি আবেশে আকুল হইয়া উঠিল। গণ্ড দুটি বাসন্তী গোলাপবৎ শিশিরস্নাত হইয়া উঠিল। মাধুরী, অনেক দিন যেন, এত আদরের ডাক শুনিতে পায় নাই। মাধুরী, গলিয়া গেল। ধীরে ধীরে কহিল,

"আমার স্বামী, আমার বড় আদরের ধন ছিলেন। তাঁহার দোষও আমার কাছে প্রীতিপ্রদ বলিয়া অনুমান হইত। যদিও কুসংসর্গে পড়িয়া মাটি হইলেন; তথাপি আমি তাঁহাকে বড় ভালবাসিতাম। কেন ভালবাসিতাম, বলিতে পারি না। তিনি যে এদিক ওদিক ঘুরিয়া আসিয়া, আমার দিকে এক একবার চাহিতেন, তাতেই যেন আমার মন প্রাণ বিবশ-বিভোর হইয়া যাইত। তখন আমার ভালমন্দ জ্ঞান থাকিত না। তাঁহার সেই চটুল চাহনি, মরমে প্রবেশ করিয়া, প্রাণ ধরিয়া যেন টানাটানি করিত। হাতের জিনিষ খসিয়া পড়িত; শুধু জিনিষ কেন? আমার সমস্ত দেহ যেন একেবারে এলাইয়া পড়িত। নিয়ত তাঁহার কথা শুনিতেই ভালবাসিতাম। তাঁহার কথার মধ্যে এমন একটা শক্তি ছিল যে, কথা শুনিলেই হৃদয়ে আনন্দের প্রবাহ ছুটিতে থাকিত। সেই আনন্দ-সায়রে কেবলি হাবুডুবু খাইতাম।

কিন্তু, আমার সেই সুখের দিন গিয়াছে; এখন আমার কালরাত্রি! দুঃসহ ও উৎকট দুঃখের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি। তিনি, আমাকে ভালরূপ সুখের মুখ দেখিতে দিলেন না। অভাগিনীকে ফেলিয়া, লোকলজ্জা ভয়ে, কোথায় চলিয়া গেলেন;—আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে পর, ভাবিলাম, এ জীবন আর রাখিব না। জীবনে সুখ কি? অনন্ত দুঃখে জীবন পরিপূর্ণ। যেখানে লালসার অতিশয় প্রলোভন, সেইখানে সুখ কোথায়? লালসার বিসর্জ্জনই সুখ। আমি সেই কামনার আগুনে পুড়িয়া একেবারে কালি হইয়া গিয়াছিলাম। স্বামীর সোহাগ, আশাতীত পাইয়াও আরও পাইতে অভিলাষ করিলাম। কথায় বলে, "বেশী খেতে করে আশ, তার হয় সর্ব্বনাশ।" আমার এখন সর্ব্বনাশ—মহা সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

সেই দিন,—সেই বিষম সর্ব্বনাশের দিন, অসহ্য জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া, মরিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু, মরিতে যাইয়া ভাবিলাম, মরিব কেন? নদী-জলে ভাঁটা হইলে কি পুনরায় জোয়ার হয় না? ভাঁটার পর জোয়ার হইবেই। এটি প্রাকৃতিক নিয়ম। এখন, যদিও ভাঁটার স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছি, তবুও এমন দিনও আসিতে পারে, যে পূনর্ব্বার আবার জোয়ারের সময় উধাও হইয়া স্বস্থানে উপনীত হইতে সমর্থ হইব। বোন, মনের গতির কি পরিবর্ত্তন সম্ভবে না? মানুষের প্রাণ নিয়ত চঞ্চল; গতি ফিরিতে কতক্ষণ? সেই 'বিশ্ববিমোহিনী' আশার প্রলোভনে প্রলুব্ধা

হইয়া, এ জীবন রাখিয়াছি ! জীবন রাখিয়াছি সত্য, কিন্তু জীবনে সুখ নাই,—শান্তি নাই। কেবল পাঁজর ভাঙ্গিয়া,—বুক ভাঙ্গিয়া অনল যেন হু হু করিয়া জ্বলিতেছে। হায় ! এ অনল কি নির্ব্বাণ হইবে না ?”

এ সময়, ইন্দুমতী কি জানি কি বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু, মাধুরী, ইন্দুমতীর স্ফুটোন্মুখ অধরখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল। বলিল,

“শুনিয়াছি, মানুষ মরিলে নাকি আকাশের তারা হইয়া থাকে। একদিন এ বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া মরিতে গিয়াছিলাম; কিন্তু মরিতে পারিলাম কই ? এটি আমার বিশ্বাস হয় না। বিশেষত মরিয়া যদি নক্ষত্র না হইতে পারি, তবে ত আর তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। কাজেই, আমার মরিবার সাধ ফুরাইল। মরিতে গিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম এবং বিছানায় পড়িয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে, আমার চিত্ত চাঞ্চল্যের অনেক উপশম হইল। মনে করিলাম, আমি ভ্রান্ত; শান্তির নিমিত্ত অন্যত্র যাই কেন ? ঘরেই ত শান্তি বিরাজমান। যখন কাঁদিলেই উচ্ছ্বসিত যন্ত্রণার একেবারে উপশম হয়, তখন আর অকালে অপমৃত্যু মরিয়া, অকলঙ্ক কুলে কালি দিতে যাই কেন ? আরো শুনিয়াছি, অপমৃত্যু মরিলে নাকি মানুষ মেঘ হইয়া, এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়ায়; চিরদিন ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদে; অনুতাপ করে; বিজলীর ছুরিকা হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া, ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। বোন, সেই দিন হইতে, বিরলে বসিয়া

কাঁদিয়া থাকি। কাঁদিলেই বরফ তুল্য জমাট দুঃখটা কিছু নরম হইয়া আসে। দুঃখটা যেন বড়ই সুখের সামগ্রী বলিয়া মনে হয়। আজ কদিন যাবৎ তোমাকে পাইয়া, আমার যেন নূতন জীবন হইয়াছে। সকল কার্য্যেই খুব উৎসাহ উদ্যম লাগিতেছে এবং সকলি ভাল বোধ হইতেছে। বোন, সেই দিন যদি তুমি এখান হইতে চলিয়া যাইতে, তবে বুঝি আমি বাঁচিতাম না। বলিয়া রাখি, আমরাও একদিন বড় মানুষ ছিলাম; আমাদেরও দালান কোটা বাগ-বাগিচা কত কি ছিল। কিন্তু তাহার কুৎসিৎ আচরণে, আমাদের বিষয় সম্পত্তি, বাড়ী ঘর, এখন অন্যের দখলে। বিষয় বিভব দিয়াও যদি তাঁহাকে ঘরে রাখিতে পারিতাম, তবুও সুখের পরিসীমা ছিল না। এ দুঃখও সুখ বলিয়া মনে হইত। ধন দিয়া কি করিব? জন থাকিলে ধন আপনি আসিত। যাঁর ধন, সেই যদি না রাখিল, তবে কে রাখিবে?"

এই বলিতে বলিতে, মাধুরী উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিতে লাগিল।

ইন্দুমতী ও শৈলবালা, ইতিমধ্যে এক দিন অন্যত্র যাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু মাধুরী কিছুতেই যাইতে দেয় নাই। ইন্দুমতী মাধুরীর গভীর ভালবাসা,—করুণ-কোমল হৃদয়খানি অনুভব করিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। অন্তরে অন্তরে, মাধুরীকে যথেষ্ট প্রশংসা করিল। প্রকাশ্যে সান্ত্বনাসূচক বাক্যে কহিল,

"কেঁদো না, বোন, কেঁদো না। কেঁদে লাভ কি?"

মাধুরী, নীরব। কিন্তু গাল বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল।

অশ্রু কাহারও কথা শুনে না। আপনি আসে, আপনিই ঝরে, আবার আপনি মিলায়।

ইন্দুমতী স্বীয় অঞ্চলে, মাধুরীর অশ্রুজল মুছাইয়া দিল। পরে, বলিল,

"তোমার স্বামী, কতদিন যাবৎ তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন ?"

মাধুরী। প্রায় ছয় বছর।

ইন্দু। এ ছ'বছরের মধ্যে তাঁর কোন সংবাদ পাওনি, বোন ?

মাধুরী। না।

ইন্দু। তাঁর অন্বেষণে লোক পাঠায়েছিলে ?

মাধুরী, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। বলিল,

"সে আর একবার ক'রে ? কতলোক যে কত স্থানে খুঁজিতে পাঠিয়েছিলুম বলিতে পারি না। এমন কি আমিও ভিক্ষার ছলে, কতস্থান খুঁজেছি ; কিন্তু কোথায়ও দেখা পেলুম না। তাঁহার কি সুন্দর মুখখানি! কেমন টানা ডাগর চোখ!! কেমন কথা!!! ইচ্ছা হয়, এখনি একবার দেখে আসি—"

এই বলিতে বলিতে মাধুরী, কয়েক পদ অগ্রসর হইল।

ইন্দুমতী, আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া মাধুরীকে ধরিল। বলিল,

"মাধুরী, তুই কি পাগল হ'লি ?"

মাধুরী, লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

—[০]—

নূতন যোগী।

একদিন অপরাহ্নে, মাধুরীদের উঠানে বসিয়া ইন্দুমতী, মাধুরী, শৈলবালা ও আর পাড়ার কয়েকটি মেয়ে রহস্যালাপ করিতেছিল। প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকগুলি মাধুরীদের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল।

প্রতিবাসিনীদিগের ভিতর কেহ বলিলেন, আমার ছেলের সঙ্গে, শ্যামনগরের জমিদার বাবুর কন্যার সহিত বিবাহের কথা হইয়াছিল। কিন্তু, কন্যা কুৎসিতা বলিয়া উনি নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। কেহ বলিলেন, আমার ছেলে বি, এ, পাশ। লক্ষ গণ্ডা লোক, আমাদের বাড়ীতে কাঁদিয়া যাইতেছে। আমরা ভ্রূক্ষেপও করিতেছি না। বড়সী ফেলিয়া বসিয়া আছি যে নগদ ১০,০০০৲ টাকা, ২৫০৲ টাকার ঘড়ি চেন ও ৫০০৲ টাকার অঙ্গুরী দিতে পারিবে, এমন মাছে ধরিলেই বড়সীতে টান দিব। কোন রমণী, ব্যথিত প্রাণের সহিত বলিলেন, আমি ত ভাই ঘড়ি চেন দিয়াও ভাল ছেলে পাইতেছি না। কেহ বলিলেন, ওপাড়ার পুলিন বাবুর কন্যা কুসুমের খুব বয়স হইয়াছে। এখন আর ঘরে রাখিলে

না থাকিবে না। কেহ বা বলিলেন, যে দিন কাল পড়িয়াছে, এতে কি আর লোকের মান ইজ্জৎ থাকিবে? পৃথিবী, রসাতলে যাইবার উদ্যোগ হইয়াছে। রসাতলে যায়ও ত না!

প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকগুলি, এই প্রকার কথোপকথন করিতেছে; এমন সময়, একটী যোগী, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সকলেই যোগীর পানে চাহিল। দেখিল, এক অপূর্ব্ব সুন্দর যোগী; যোগীর তেজঃপুঞ্জ বপুঃ, প্রলম্বিত জটাভার, প্রশস্ত ললাট; দীপ্ত চক্ষু, বিস্তীর্ণ বক্ষ, সুদীর্ঘ ভুজযুগল, গলে রুদ্রাক্ষের মালা দোলায়মান, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সর্ব্বাঙ্গ বিভূতি বিভূষিত; হস্তে ত্রিশূল। যোগীকে দেখিয়া সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল—অনেকে প্রণিপাত করিল। যোগী, ইঙ্গিতে সকলকে নিষেধ করিলেন। মাধুরী, তাড়াতাড়ি একখানা কুশাসন আনিয়া, যোগীকে বসিতে দিল এবং গভীর প্রীতি ও ভক্তির সহিত, যোগীর পায় পড়িয়া প্রণাম করিল। যোগী, মাধুরীর হাত ধরিয়া উঠাইল। উঠাইয়া নিজে মাধুরীর প্রদত্ত কুশাসনে বসিলেন।

স্ত্রীলোকগুলি, তখন যোগীকে ঘেরিয়া বসিল। যোগীর নিকট বসিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিতা হইল না। একটা মধ্যমবয়স্কা স্ত্রীলোক বসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, আমার বড় ছেলে শীঘ্র দেশে আসিবে কি? এ রমণীর দেখাদেখি কালীতারা কহিল, ঠাকুর, আমার খুকীর জ্বর পীলে হইয়াছে, কিসে ভাল হইবে? তরঙ্গিণী জিজ্ঞাসা করিল, এবার আমার বোন দিদির কি হবে, ঠাকুর? মাখন জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, আমার দেবর শীঘ্র বাড়ী আসিবেন

কি? মাখন, চিঠি পাইয়াছে যে, তাঁহার স্বামী ও ঠাকুরপো; একত্রে বাড়ী রওনা হইয়াছেন। বোধ হয়, মাখন, লজ্জাবশত দেবরের নাম দিয়া স্বামীর আগমন বার্ত্তা জানিবার অভিলাষ করিল। মাতঙ্গিনী প্রশ্ন করিল, আমার খোকাটির ত কোন অসুখ বিসুখ হইবে না? যামিনী কহিল, আমার দিদিরী সন্তান হয় না; একটি ঔষধ দিবেন? ঔষধের কথা শুনিয়া, ভামিনী, দামিনী, কামিনী, ধনী, রামমণি, কৃষ্ণমোহিনী, বিলাসিনী, সুহাসিনী, নিতম্বিনী, রাসমণি, বিনোদিনী, বিধুবদনী প্রভৃতি রমণীগণ, সকলেই একে একে, কেহ ছেলে হওয়ার নিমিত্ত, কেহ ভগ্নীর জন্য, কেহ স্বামী বশীভূত করিবার জন্য, কেহ সন্তানের অসুখের নিমিত্ত ঔষধ চাহিতে লাগিল। যোগী, এ পর্য্যন্ত গণ্ডগোলের নিমিত্ত, কাহার কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন নাই। উত্তর দিবারও কোন সুযোগ ছিল না। কারণ, স্ত্রীলোকগুলির উপর্য্যুপরি প্রশ্ন হওয়ার দরুণ, একটি যেন হাট মিলিয়াছিল। কে যে কি বলিতেছিল, যোগী তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না। বিশেষত কাহার কথা কেহ বুঝিতে পারিতেছিল না।

যোগীকে নীরব দেখিয়া রমণীগণও নীরব হইল। শৈলবালা, কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিল। বলিল,

"ঠাকুর, গণিতে জানেন?"

যোগী, ঘাড় আন্দোলিত করিয়া কহিলেন,

"জানি। কেন? কিছু গণিতে হবে নাকি?"

শৈলবালার কথায়, যোগীকে উত্তর প্রদান করিতে দেখিয়া, রমণী মহলে, আবার তুমুল গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। সকলেই শৈলবালাকে দিয়া, নিজ নিজ কথা, জিজ্ঞাসা করিবার জন্য, কেহ শৈলবালার অঞ্চল, কেহ হাত, কেহ চুল ধরিয়া টানিতে লাগিল। শৈলবালা তখন বিষম উৎপাতে পড়িল। এ সব দেখিয়া, যোগী মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। অনেক তাক্ত বিরক্তের পর, শৈলবালা, সকলকে আশ্বাস দিয়া শান্তি সংস্থাপন করিল। পরে, যোগীর পরীক্ষার্থ মাধুরীকে দেখাইয়া কহিল, "ঠাকুর, ইহার নাম কি?"

যোগী, কুসুম হাসি হাসিলেন। কহিলেন, "মাধুরী।"

শৈলবালা, আশ্চর্য্যান্বিতা হইল। মাধুরী কিন্তু যোগীর স্ফুটোন্মুখ হাসি দেখিয়া, যোগীর পানে অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিল। শৈলবালা, কি অন্য কোন রমণী, বোধহয়, সেই হাসি দেখে নাই। যোগীর মুখে হাসি দেখিলে, কে যে কি ভাবিত তাহা ভগবানই জানেন। যোগী, আবার কহিলেন,

"প্রায় মাসেক হইল, মাধুরীর ঠাকুরমার মৃত্যু হইয়াছে।"

বস্তুত প্রায় একমাস হইল, মাধুরীর ঠাকুর মা, এ সংসার লীলা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যোগীর কথা শ্রবণ করিয়া শ্রোত্রীবর্গ বিস্ময়ে অবাক্ হইল। ক্রমশ যোগীর উপর তাহাদের অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন রমণীগণ, একে অন্যের সহিত যোগীর গুণপণা সম্বন্ধে নানা প্রকার কাণাকাণি করিতে আরম্ভ করিল। শৈলবালা আবার কহিল,

"মাধুরীর স্বামী জীবিত আছেন কি, ঠাকুর?"

শৈলবালা, মাধুরীর সকল কথা, ইন্দুমতীর প্রমুখাৎ শুনিয়াছিল। যোগী, গম্ভীরভাবে কিছুকাল থাকিয়া কহিলেন, "আছেন।"

মাধুরী, তখন একাগ্রচিত্তে, যোগীর কথা ও কণ্ঠস্বরের প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিল এবং যোগীকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিতেও ছাড়িল না। যোগীকে দেখিতে দেখিতে যেন কেমন কেমন হইতে লাগিল। এদিকে শৈলবালা জিজ্ঞাসা করিল,

"মাধুরীর স্বামী কি আর দেশে ফিরিবেন না?"

যোগী তখন চতুরতা করিতে আরম্ভ করিলেন। একেবারেই কাহার কথার কোন উত্তর দিলেন না। কেহ যেন কিছু বুঝিতে না পারে, সেইভাবে মাটিতে খড় দিয়া আঁক দিতে আরম্ভ করিলেন। মুখে চিন্তার ছায়া পড়িল। পরে, আঁক দিতে দিতে কহিলেন, "না।"

মাধুরী, একেই রবি-কিরণ-বিদগ্ধ বিষণ্ণ পুষ্পবৎ। যোগীর কথা শ্রবণ করিয়া আরও বিমর্ষ ও মলিনা হইল। তথাপি সেইস্থানে যোগীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিল না বা কিছু বলিল না। কেবল, শৈলবালাই সকাতরে কহিল,

"কেন, ঠাকুর?

যোগী অবহেলার সহিত বলিল,

"তা কি করে ব'লব?"

মাধুরী তখন সেইখান হইতে উঠিয়া গেল। শৈলবালা আবারও বলিল,

"মাধুরীর ভাগ্যে কি তবে সুখ নেই?"

যোগী, ধীরে অথচ উদারভাবে কহিলেন,

"মানুষে সুখ দুঃখের কথা বলিতে পারে না। এখানে আমরা, চিরান্ধ! অদৃষ্টে থাকিলে সুখ ঘটিতেও পারে।"

শৈলবালা, ঈষৎ হাসিয়া কহিল,

"শুনেছি, যোগীগণ ত্রিকালজ্ঞ! আপনিও ত একজন, মহাযোগী। তবে, আপনি বলিতেছেন না কেন?"

যোগী, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন,

"সুখ দুঃখ পরিবর্ত্তনশীল। একের অবসানে অন্যের অভ্যুদয়। তবে কি না মা, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে, কেহ সুদীর্ঘকাল, কেহ বা অতি অল্প সময় সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।"

এই বলিয়া, যোগী প্রস্থান করিলেন। অন্য কোন রমণীর কোন কথারই উত্তর দিলেন না। তখন রমণী মহলে, যোগীর যথোচিত নিন্দা হইতে লাগিল।

ইন্দ্র /

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—০—

সরসী তীরে।

ফুট্ ফুট্ জোছনা রজনী। জগত, শশাঙ্কের অমল কিরণ প্রভায় ঢল ঢল—বড় প্রফুল্ল। আকাশের গায় তারা ফুটে নাই; কেবল দুই চারিখানি নিখুঁত শুভ্র মেঘখণ্ড চাঁদের উপর দিয়া, এলোমেলো তুলা রাশির ন্যায় গড়াইয়া গড়াইয়া যাইতে লাগিল। চাঁদ, চোরের মত জলদের বাড়ীতে, ধীরে ধীরে সিঁদ কাটিতে লাগিল; আবার বাহিরে আসিয়া একটু এদিক ওদিক দেখিয়া গেল। জলদ ভারি হুসিয়ার লোক; বিদ্যুতের অসি বক্ষে করিয়া নিদ্রা যায়। শশাঙ্ক, জলদের বাড়ীতে চুরি করিতে অপারগ হইয়া, ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

একটী সরোবরের চারি পারে, সারি সারি বৃক্ষাবলী বিরাজিত। পাতায় পাতায় কোলাকুলি—পল্লবঘন শাখা। পাতা ও শাখার ব্যবচ্ছেদে শশাঙ্ক-কিরণ, বৃক্ষতলে নিপতিত হইয়া; স্থানে স্থানে রজত শয্যা নির্ম্মাণ করিতেছিল। বৃক্ষ পত্রগুলির উপর চাঁদের কিরণ পড়াতে, রজত পত্র

বলিয়া ভ্রম হইতেছিল এবং বায়ুভরে মৃদুমন্দ দুলিতেছিল। সরসী বক্ষে, কুমুদ, কমল ও কহ্লারের মহামেলা বসিয়াছে। কোনটা ফুটোন্মুখ, কোনটা ধীরে ধীরে ফুটিতেছে, কোনটি আবার ফুটিয়া হাসিতেছে। মৃদুল পবন বিতাড়িত জলোচ্ছ্বাসে, সেই প্রস্ফুটিত কমলের প্রতিবিম্ব, কখনও সুদীর্ঘ, কখনও হ্রস্ব, কখনও বা খণ্ডিতভাবে জলের ভিতর প্রতিফলিত হইতেছিল।

সেই সরোবরের পারের বৃক্ষতলে নিরাশ্রয়া একটা রমণী শায়িতা। শশধরের সুস্নিগ্ধ কিরণ রমণীর মুখমণ্ডলে পতিত হইয়া মুখখানির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিল। একে ত মুখখানি নিটোল, চাঁদপানা; তাতে আবার চাঁদের কিরণ; যেন সোণায় সোহাগার সমাবেশ হইল। চাঁদে কলঙ্ক আছে; কিন্তু এ রমণীর মুখখানি নিষ্কলঙ্ক—নিখুঁত; বিক্ষিপ্ত কেশপাশ; গভীর নিদ্রায় নিদ্রিতা। মুখে গভীর বিষাদের কালো ছায়া পড়িয়াছে; তবুও মুখখানি সুন্দর—সৌন্দর্য্য যেন আরো ফুটিয়া পড়িতেছে।

সেই জোছনা রজনীতে, সেই বৃক্ষতল দিয়া, একটা যুবক যাইতেছিল। জ্যোৎস্না রাত্রি বলিয়া, যুবক নির্ব্বিঘ্নে গমন করিতেছিল। কিন্তু, যুবকের প্রতি পদ বিক্ষেপেই, যুবক যেন গভীর চিন্তামগ্ন, তাহার পরিচয় দিতেছিল। এক পায়ের পর, অপর পা যেন বড়ই কষ্টে পড়িতেছিল। পায় যেন শক্তি নাই—অবশ। চলিতে চলিতে সহসা যুবকের দৃষ্টি সেই বৃক্ষতল শায়িতা রমণীর উপরে পড়িল। সে তাহার সন্নিকটে যাইয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, এ যেন একটী বাতাহতবৃন্তচ্যুত শুভ্র-কুসুম-কোরক

মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। নীলাকাশের ভিতরে ভিতরে, শুভ্রমেঘ যেমন অনুপম সুন্দর দেখায়, বিক্ষিপ্ত-কুন্তলা যুবতীর মুখখানি ততোধিক রমণীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

যুবক তখন ধীরে ধীরে আবার রমণীর মুখের পানে চাহিল। চাহিয়াই শিহরিয়া উঠিল। একি! এ যে পরিচিত মুখ। শুধু পরিচিত নয়—এ যে আমার নীরব সাধনার বাঞ্ছিত ও জাগ্রত প্রতিমা —এ যে সেই শৈলবালার ইন্দুনিভানন! তা' এ গভীর নিশীথে, এখানে—এ নির্জ্জন বাপীতটে শায়িতা কেন? নিঃশব্দে যুবক বসিল। বসিয়া ধীরে ধীরে যুবতীর মস্তকটি নিজের হাঁটুর উপর তুলিয়া লইল এবং ততোধিক ধীরে ধীরে যুবতীর বিক্ষিপ্ত কেশপাশ গুছাইয়া গুছাইয়া যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে লাগিল। হঠাৎ যুবতী, "উঃ" করিয়া উঠিল। যুবক, তাড়াতাড়ি মাথাটি হাঁটু হইতে নামাইয়া রাখিল। মাথাটি মাটিতে রাখিল বটে, কিন্তু প্রাণে বিষম বাজিল। প্রাণের ব্যথায়, উড়ানীখানা, মাথার নিচে দিয়া রাখিল এবং সতৃষ্ণ লোচনে, যুবতীর পানে চাহিয়া রহিল। যুবতী পুনরায় যন্ত্রণায় "উঃ উঃ" করিয়া উঠিল। যুবক বুঝিল, যুবতী কোন বিষম যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে। যুবক, বিহ্বল। একবার ইচ্ছা করিল, রমণীর নাম ধরিয়া ডাকে, কিন্তু লজ্জা আসিয়া তখনি বাসনার পথে বাধা দিল। লজ্জার উৎপীড়নে ভালমন্দ বিচার শক্তি অন্তর্হিত হইল। যুবক তখন আর এ কুসুম ধূলি বিলুণ্ঠিত দেখিতে পারিল না। যুবতী বড়ই বেদনা সূচক কাতরোক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল, যুবকের

প্রাণেও ততই শেলবৎ বিঁধিতে লাগিল। যুবক আর সহ্য করিতে না পারিয়া, ব্রীড়া বিমিশ্রিত অস্ফুটস্বরে ডাকিল, "শৈ—"

যুবকের মুখে আর কথা ফুটিল না। চির বাঞ্ছিতের সহিত যুবকের আজ এই প্রথম প্রীতি-সম্ভাষণ। রমণী তখন যন্ত্রণায় পাশ ফিরিল। যুবক, এবার যুবতীর মুখের নিকট মুখ লইয়া ডাকিল, "শৈল, ও শৈ—"

যুবক, এবারও বেশী কিছু বলিতে পারিল না। যদিও বেশী কিছু বলিতে পারিল না; তথাপি এ সম্বোধনে যুবতী ঈষৎ চোখ মেলিয়া চাহিল। দেখিল, তারাকান্ত সম্মুখে বসিয়া আছে। যুবতীর বেদনাপূর্ণ প্রাণে তখন হর্ষ ও আশার তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। আবার চাহিল, এবার উভয়ে উভয়ের চোখে চোখে পড়িল,—চারিচক্ষু একত্রে মিলিত হইল। সে চোখে পলক নাই —বিরাম নাই; যেন নির্বাত-নিষ্কম্প প্রদীপ তুল্য স্থির দৃষ্টি! এ দৃষ্টিতে শৈল ও তারাকান্তের হৃদয় সাগরমন্থনের ন্যায় মথিত হইতে লাগিল। কিন্তু, কেহ কোনরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিল না। শৈলবালা, তৃষ্ণায় অত্যন্ত আকুল হইয়াছিল। কাতরকণ্ঠে কহিল, "প্রাণ যায়,—জল!"

তারাকান্ত, তাড়াতাড়ি সরোবর হইতে অঞ্জলিনিবদ্ধ করে জল আনিয়া, শৈলবালার মুখে ধীরে ধীরে ঢালিয়া দিল। শৈলবালা, তারাকান্ত প্রদত্ত জলপান করিয়া কিছু সুস্থির হইল। ক্রমে ক্রমে শৈলবালার নির্ব্বাণোন্মুখ প্রাণে শক্তিসঞ্চার হইতে লাগিল। তারাকান্ত তখন শৈলবালাকে উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "শৈল, এখানে?"

বিষাদে বিবর্ণা শৈলবালা কহিল, "ইন্দুমতীকে খুঁজিতে এসেছিলাম।"

তারাকান্ত, আশ্চর্য্যভাবে কহিল, "ইন্দুমতী কি তোমার সঙ্গে নেই? সে কোথায়?"

তখন শৈলবালা সংক্ষেপে অথচ ধীরে ধীরে বলিল, "আমরা যে বাড়ীতে থাকিতাম, আজ কয় দিন হইল, সেই বাড়ীর মাধুরী কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাই, তাহাকে সেই দিন অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত গ্রামে গিয়াছিলাম; ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই বাড়ীতে ইন্দুমতী নাই; না দেখিয়া ভাবিলাম যে, বোধ হয় নিকটেই কোন বাড়ীতে মাধুরীর অন্বেষণার্থ গিয়াছে, এখনি হয়ত ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু, ইন্দুমতী আর ফিরিল না। গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিতে আমার কিছু রাত্রি হইয়াছিল। আজ প্রায় ৪।৫ দিন যাবৎ অবিশ্রান্ত খুঁজিতেছি, কোথায়ও ইন্দুমতীকে পাইতেছি না। এখন আমার বোধ হয় যে, ইন্দুমতীর অপরূপ রূপ দেখিয়া, হয়ত কোন নরপিশাচ তাহাকে লইয়া গিয়াছে।"

এই বলিয়া, শৈলবালা রোদন করিতে লাগিল। তারাকান্তও শৈলবালার কথা শ্রবণ করিয়া, ইন্দুমতীর নিমিত্ত দুঃখিত ও চিন্তাযুক্ত হইল। আর বুঝিল, ইন্দুমতীর অন্বেষণ-জনিত ক্লেশেই শৈলবালার অজ্ঞানাবস্থা ঘটিয়াছে। ঐ অনুমান যথার্থ। তারাকান্ত মাধুরীর পরিচয় উল্লেখ করাতে, শৈলবালা অন্য সময়ে বলিবে বলিল। তারাকান্ত, আর কিছু না বলিয়া, শৈলকে সঙ্গে করিয়া বাসস্থানে চলিয়া গেল

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—[০]—

পথে আলাপ।

শীত যায় যায়;—বসন্ত উদয়োন্মুখ। বসন্ত আসে আসে, আসে না। উঁকি ঝুঁকি দেয় দেয়, দেয় না; কোকিল ডাকে ডাকে, ডাকে না; জগত হাসে হাসে, হাসে না; তরুদল নবকিশলয়, ছাড়ে ছাড়ে, ছাড়ে না; বাসন্তীকুসুম ফোটে ফোটে, ফোটে না। এখনও শীতের আবছায়া যেন সকলের মুখাবৃত করিয়া রহিয়াছে।

ফাল্গুন মাস। প্রথমভাগ। মুক্তালতা গ্রামে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ সংলগ্ন পথ। একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে, পথ চলিতে চলিতে একটী যোগী ও একটী রমণী আলাপ করিতে করিতে যাইতেছিল। যোগীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রমণী চলিয়াছে। যোগী কিন্তু রমণীর দিকে একবার ভুলেও ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না। যোগী কহিলেন,

"এখনও গৃহে ফিরিয়া যাও।"

রমণী। আর গৃহে যাব না।

যোগী। যাবে না, কেন?

রমণী। যাবার স্থান কৈ?

যোগী। যে বাড়ীতে ছিলে?

রমণী, সবিষাদে কহিল,

"সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া আপনার সঙ্গ ধরিয়াছি।"

যোগী। আমার সঙ্গ ধরিলে কেন? আমার সঙ্গে কোথায় যাইবে?

রমণী। আপনি যেখানে যাবেন।

যোগী একটু বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া বলিলেন,

"অ্যাঁ! বল কি, আমার সঙ্গে যাবে? আমি যোগী মানুষ; তুমি স্ত্রীলোক অথচ—তোমার এই মধুর যৌবন কাল। জান ত এ সময়ে গৃহের বাহির হওয়া অনুচিত।"

রমণী যোগীর কথা শ্রবণ করিয়া, অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল,

"অনেক দিন হয়, এ যৌবন আপনার চরণারবিন্দে অর্পণ করিয়াছি। এখন দয়া করিয়া গ্রহণ করুন।"

যুবতীর নয়নাশ্রু ঝরণার জলের ন্যায় বহিতে আরম্ভ করিল।

যোগী। ছি! ছি! ও কি কথা?

রমণী। প্রাণের কথা—স্বামী স্ত্রীর কথা।

যোগী, সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন,

"আমি তোমার কে? না জেনে না শুনে কেন পরের পায়ে প্রাণটি দিলে?"

রমণী, সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। বলিল,

"আমি বেশ জেনেছি—তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তাই, তোমার পায়ে প্রাণ দিতে চলেছি।"

যোগী, জিভ্ কাটিয়া কহিলেন,

"সে কি! তুমি হ'লে গৃহস্থের বৌ। তোমার স্বামী রহিয়াছেন। ছি! আমাকে কেন স্বামীর ন্যায় ভাবিতেছ? এতে যে তোমার স্ত্রীধর্ম্ম নষ্ট হ'বে। পতিব্রতা রমণীর পরপুরুষকে দেখিতেও যে নিষেধ।"

এ কথায়, রমণীর বক্ষ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সকাতরে কহিল,

"এ পরপুরুষ, আমার পরশপাথর। তোমার সংস্পর্শে আজ আমার নারী-জীবন সার্থক হইবে।"

যোগী ঘৃণিত স্বরে কহিলেন, "তবে তুমি কলঙ্কিনী?"

যোগী যে এ কথাটি কহিলেন, সে কেবল যুবতীর মন পরীক্ষার্থ।

কিন্তু, যোগীর কথা শ্রবণ করিয়া, রমণীর মস্তকে যেন বিষম বজ্রাঘাত হইল; বাক্‌শক্তি রহিত হইল; মাথা ঘুরিতে লাগিল; চতুর্দ্দিক শূন্যময় অবলোকন করিল এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। মাথাটি, সেই পথপার্শ্বস্থ বটবৃক্ষের মূলে আহত হইল। মূলের নীচে, একটী তীক্ষ্ণ বিষধর ছিল। বেদনা পাইয়া, রমণীকে ভীষণ দংশন করিয়া, পার্শ্বস্থ জঙ্গলের ভিতর লুকাইল। তীব্র বিষের জ্বালায়, রমণীর প্রাণ যায় যায় হইল; অস্ফুট ধ্বনি করিতে

লাগিল। সেই অস্ফুট স্বর শুনিয়া যোগী, রমণীর অভিমুখে ফিরিয়া চাহিলেন এবং ব্যাকুলতার সহিত কহিলেন,

"এ কি, মাধুরী ?"

মাধুরী, যোগীর দিকে একবার সতৃষ্ণলোচনে চাহিল। বলিল "না। কিছুই নহে। মাথাটি ঘুরিতেছে ; তাই একটু শুইলাম।"

যোগীর কিন্তু এ কথাটি বিশ্বাস হইল না। তাড়াতাড়ি আসিয়া, মাধুরীর মাথাটি লইয়া নিজের হাঁটুর উপর রাখিলেন এবং এক দৃষ্টে মাধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন, মাধুরীর মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে লালা বিনির্গত হইতেছে ; সর্ব্ব শরীর মিহি কালো বর্ণ হইতেছে। দেখিয়া যোগী অস্থির হইলেন ; কহিলেন,

"মাধুরী, প্রাণ আমার ; বল এমন করিতেছ কেন ?"

মাধুরী, নীরব। কিন্তু তাহার চক্ষু দিয়া অবিশ্রান্ত জল পড়িতে লাগিল এবং এক একবার যোগীর দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

এই যোগীই আমাদের মাধুরীর স্বামী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মাধুরীর স্বামী অসৎ সংসর্গে পড়িয়া, পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি উড়াইয়া দেশত্যাগী হইয়াছেন। এতদিন কোথায় ছিলেন, কেহ জানিত না। আমরা সেদিন মাধুরীর স্বামীকে ছয় বছর পর, মাধুরীদের বাড়ীতে যোগী বেশে দেখিয়াছি। মাধুরীও স্বামীকে দেখিয়া বেশ চিনিতে পারিয়াছিল। মাধুরীর ইচ্ছা ছিল, পুনরায় স্বামীকে লইয়া সংসারী হইবে। কিন্তু

যোগীর কথা শুনিয়া—যোগীর অনভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ইন্দু ও শৈলবালার কথোপকথন কালে উঠিয়া আসিয়া পথের ধারে দাঁড়াইল। ভাবিল যে, স্বামী যদি গৃহে না থাকেন, তবে আর সংসারে থাকিয়া কি হইবে—স্বামীর সঙ্গে সঙ্গেই যাইবে মাধুরীর স্বামী, সংসার ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া যোগাভ্যাস করিতেছেন কেবল গুরুরাদেশে মাধুরীকে একবার দেখিতে এসেছিলেন মাত্র তিনি সংসারের উপর বীতস্পৃহ। কাজেই, ইন্দু ও শৈলবালার নিকট সংসারে থাকিতে, প্রকারান্তরে অনভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যখন যোগী চলিয়া যাইতেছিলেন; তখনি মাধুরী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছে।

যাহাহউক, মাধুরী, আসন্নকাল অতি সন্নিকট দেখিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, যম তুমি এ'সেছ, বেশ ক'রেছ। এত দিনে যে তোমার এ অভাগিনীকে মনে পড়েছে, এই যথেষ্ট। তুমি আমার প্রকৃত আত্মীয়। উপযুক্ত সময়ে আসিয়া খুব ভাল করিয়াছ যখন এসেছ তখন একটী মিত্রের কার্য্য করিও—আমি মরিলে এই যে আমি, আমার স্বামীর পায়ের উপর আছি, এখান হইতে অন্যত্র নিও না। যম, তোমার পায়ে ধরি, অভাগিনীর এ সামান্য অনুরোধটী রাখিও। আমি অনেক দিনের পর, এই রাজীব-চরণযুগল পাইয়াছি। কিছুকালের নিমিত্ত ওপায়ে মাথা রাখিয়া সুশীতল হইতে দিও। আমার যে বড় তাপিত পরাণ!

এ সময় মাধুরীর শ্বাস ঘনঘন বহিতে লাগিল; শরীর বরফবৎ হিম হইয়া উঠিল; চক্ষু ঘুরিতে লাগিল। যোগী সকাতরে

হিলেন,

"মাধুরী এই কি নে——"

যোগীর যোগ ভাঙ্গিল; চোখে যমুনা বহিল। মাধুরী, স্বামীর াথে জল দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, কবল একদৃষ্টিতে যোগীর দিকে ঘন ঘন চাহিতে লাগিল। মাধুরী দ্ধকণ্ঠে ও বড় কষ্টে কহিল,

"নাথ, যাই, সময় হইয়াছে। আর থাকিতে পারিলাম না।"

মাধুরী আর বলিতে পারিল না, যোগীর দিকে চক্ষু স্থির রিয়া, যোগীর পায়ে মাথা রাখিয়া অনন্ত নিদ্রা গেল।

"নাথ, যাই, সময় হইয়াছে। আর থাকিতে পারিলাম না।" —১৬৮ পৃষ্ঠা

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধের ভাবনা।

কেন মায়া রোগ জন্মিল? এ বিষম রোগ কি পাপে জন্মে? এ রোগের হাতে, পড়িয়া দিবানিশি কাঁদিতেছি—অনন্ত যাতনা ভুগিতেছি। শান্তি নাই, সুখ নাই, হর্ষ নাই, কেবলি বিষাদের ছায়া ভীষণভাবে ঘেরিয়া রহিয়াছে। তাদের কি যেন হবে হবে; এই বুঝি হ'ল, এবার হ'লে আর রক্ষা নাই; পূর্ব্বে এই সব কুভাবনায় কুচিন্তায়, নিয়ত শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন ছিলাম। ইন্দুমতীর বিবাহের পর ভাবিলাম, এখন আর কোন জঞ্জাল রহিল না। নির্ব্বিঘ্নে পরমার্থ সাধন করিতে পারিব। কিন্তু, হায়! সে কুহকিনী আশাও বৃথা হইল। সংসারের বৃথা মায়ার বন্ধন ছিড়িতে পারিলাম না। রাক্ষসী মায়া আমার সেই পথে কাঁটা দিয়াছে। এখনও চিত্ত নিয়ত চঞ্চল—সেই মুখখানি দেখিবার নিমিত্ত। বিধি কেন সেই আঁখি, সেই মুখখানি দেখান না? প্রাণ যে এখনও উদ্বিগ্ন। উঃ! কি পাপে এ মায়াজালে আবদ্ধ হইলাম? মায়ার মুখটি দেখিতে পরম রমণীয় বটে, কিন্তু পরিণাম বড় শোচনীয়! আগে জানিলে, কে এ মুখ দেখিয়া, ক্লেশ ভুগিতে যাইত?

আমার তিন কাল গিয়াছে; এক কাল আছে। আজ বাদে কাল আসিয়া, যমকিঙ্কর হাতে হাতকড়া দিবে! কালের হাতকড়া বড় কঠিন! হায়! এখনও আমার ঘুম ভাঙ্গিল না? এখনও আমি ভবের গাছের মাকাল ফল দেখিয়া মজিয়া রহিয়াছি! এ ফলে আমার কি গুণ দিবে? বরং দিন দিন চরম ফলের হানি করিতেছে। হায়! হায়! আবার সেই ভাবনা মনে এলো? ইন্দু, শৈল, তোমরা কোথায়? প্রাণ যায়,—তোমাদিগকে না দেখিয়া আমার প্রাণ যায়—ইহকাল পরকাল, সমস্তই যায়। দু'কূল গেলে আর দাঁড়াব কোথায়? ইন্দু, শৈল, তোমরা বরং আমার এক কূল রক্ষা কর! এসো মা, এসো, এ হতভাগার ভাঙ্গন কূলের দুরবস্থা দেখিয়া যাও! আসিবে না? হাসিবে না? কথাও কহিবে না? কেন? আমি তোমাদের কি করিয়াছি? মা, ইন্দু, আমার দোষ কি? যাইবার সময় কেন আমাকে বলিয়া গেলে না? বলিয়া গেলে, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাইতাম। তোমার দুঃখে আমারও দুঃখ। শৈল, তুমি ত বুদ্ধিমতী; তুমি কেন এমন করিলে? তোমার উচিত ছিল—এই টাকপড়া মাথাটাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া। তা হলে, সর্ব্বদা তুমি টাক লইয়া রহস্য করিতে পারিতে। এখন তোমরা কোথায়? এ হতভাগা যে বৃক্ষমূলে বসিয়া কত দুঃখ, কত কষ্ট পাইতেছে; তা কি দেখিবে না? মা হইয়া সন্তানের দুঃখ বুঝিতে পার না?

পাপ কি ভীষণ! কুহক পরিপূর্ণ—পাপের গতিবিধি। প্রতুল; তুই কেন ইন্দুর সুখের কপাল ভাঙ্গিলি? ইন্দু, তোর নিকট

কি অপরাধ করিয়াছিল ? ইন্দু আমার সারল্যের পুতলি—ধার্ম্মিকের দুহিতা। সেই ধর্ম্মপ্রাণে কেন দংশন করিলি ? তোর, ভাল হইবে কি ? ভগবান অবশ্য বিচার করিবেন। লোকের চোখে ধূলা দিলে কি হইবে ? ভগবানের চোখে ধূলা দিতে পারিবে কি ? হায় ! আমি অভাগা কেন মহামারিতে মরিলাম না ? বুঝেছি, এ পাপ মরিলে, এ দুঃখভোগ করিত কে ? প্রভু, আপনারা দেবতা, সুখে স্বর্গে গিয়াছেন। এ পাপ জীবনকে, এই শেষ কালে, এ বিষম যন্ত্রণা ভুগিতে রাখিয়া গিয়াছেন কি ? এখন একবার স্মরণ করুন। যথেষ্ট হইয়াছে—আর সহিতে পারি না। রামভদ্র, পথস্থিত একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া এই প্রকার ভাবিতেছিল।

যে দিন ইন্দুমতী ও শৈলবালা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যায়, রামভদ্রও সেইদিনই তাহাদের অন্বেষণার্থে বাহির হইয়াছে। রামভদ্র, অনেক গ্রাম, অনেক দেশ ঘুরিয়াছে ; কিন্তু, কোথায় ইন্দুমতীকে পাইতেছে না। না পাইয়া, হতাশ হইয়াছে। তাই, বৃক্ষমূলে বসিয়া, মনের ব্যথায় অনুতাপ করিতেছিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—•• ০ ••—

নদীবক্ষে।

সপ্তমীর চাঁদ উঠিয়াছে। জগত যেন হর্ষে ডগমগ করিয়া সিতেছে! নদী, রজত মেখলা পরিধান করিয়াছে। স্নিগ্ধ অনিলে ী-বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিল্লোল তুলিয়াছে। বীচিমালাতে চন্দ্র-কিরণ পতিত হওয়ায় চিক্ মিক্ করিতেছে। পুলকে নদীর যেন মাঞ্চ হইতেছে।

নদী সৈকতে একখানা পানসী তরণী বাঁধা রহিয়াছে। নৌকা ধিয়া, মাঝি ও মাল্লাগণ, সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে ীরে উঠিয়াছে। তরণীতে দুটি আরোহী, যুবক ও যুবতী। বক, মাঝিদের প্রত্যাবর্ত্তনে দেরী দেখিয়া, নৌকার ছাদের উপরে ঠিল। দেখিল, বড় পরিষ্কার রজনী। জগতের গায় যেন ানন্দ ধরিতেছে না। নদীর জল তির্ তির্ তরঙ্গ তুলিয়া প্রবাহিত ইতেছে। দেখিয়া যুবকের অন্তঃকরণে হর্ষের জোয়ার ছুটিল। ীরে ধীরে তরণী খুলিয়া দিল, যুবক নৌকা বাহিতে সুপটু; াইল বাহিয়া নৌকাখানা নদীবক্ষে লইয়া চলিল। তরণী, মৃদু ন্দ অনিলান্দোলিত উচ্ছ্বাসে সুন্দর নাচিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ নদী ক্ষে যাইয়া হাইল ছাড়িয়া দিয়া ছাদে গিয়া বসিল।

তরণীখানা, স্রোতাভিমুখে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল। যুব
একবার নীচে গেল। পানসীর ভিতরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ গু
উন্মুক্ত ছিল। চন্দ্রের কিরণ গবাক্ষের ভিতর দিয়া আসি
একখানি মুখের উপর পড়িয়াছে—অবগুণ্ঠনের আধখানি, স
হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল। সপ্তমীর চাঁদের কি তাই এত আন
—এত উল্লাস? সখীকে জাগাইবার জন্য কত কাকুতি, ক
মিনতি করিল—কিছুতেই ত সখী জাগিল না। চাঁদ, একব
সখীর এলায়িত কুন্তল গুচ্ছ ধরিয়া টানিল, আবার কাণের ভি
দিয়া প্রাণে পৌঁছিল—ডাকিল। সখী তো জাগিল না—সখী
নিস্পন্দ। চাঁদ, সখীর নিকট পরাজিত হইল।

যুবক নীচে আসিয়া চাঁদের ব্যবহার দেখিল এবং একদৃ
সকুন্তল মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া রহিল। ছাদে যাইতে ভুলি
গেল। যুবকের যেন কি মনে হইল; ধীরে ধীরে বাক্স খুলি
একটী বাঁশী বাহির করিল এবং বাঁশী লইয়া ছাদে উঠিল
ছাদে উঠিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল। ভাবিল, সেই যমু
সেই বাঁশী, যমুনার আবার সেই উজান! সত্য সত্যই কি বাঁশীর স্ব
যমুনা উজান বহিত? সেই বাঁশীর, এমন কি গুণ ছিল যে, য
ফিরিয়া চাহিত?

এই ভাবিয়া যুবক, বাঁশীতে চুম্বন করিল। বাঁশী আদ
গদ্ গদ্ হইয়া উঠিল। খাম্বাজের সহিত ঝিঁঝিটের বিব
দিয়া, পিলুতে হুলুধ্বনি দিল; পুরবী পুরোহিত, ধীরে ধী
মন্ত্রপাঠ করিয়া বিদায় হইলেন; ইমণকল্যাণ আসিয়া নব দম্পতী

জলের গঙ্গাজল সিঞ্চন করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিল; জয়জয়ন্তী আসিয়া জয়ধ্বনী করিল; লুমের মিহিদানা, কানেড়ার কোপ্তা; চালেংড়ার কালিয়া, ভূপালীর পোলাউ প্রস্তুত হইতে লাগিল; বরজবাহারের চাটনির বন্দোবস্ত হইল; বাগেশ্রী—পাহাড়ী—সাহানা পরিবেশনে নিযুক্তা হইল, নিশীথে বরযাত্রীর দল—বেহাগ, শঙ্কর মেব, মহাশয়েরা ভোজনে বসিলেন। এ মহাভোজনের সময়, হঠাৎ শৈলবালা আসিয়া, যুবকের নিকট উপনীত হইল। পরে, কহিল,

"ছি! ছি! তুমি বড় বেয়াদপ, আমার ঘুম ভাঙ্গলে কেন?"

যুবক। শান্তিভঙ্গের অপরাধ করিয়াছি; দণ্ড দাও।

যুবক, তারাকান্ত।

সেই সরসী-তীর সংক্রান্ত ঘটনার পর হইতে তাহারা ইন্দুমতীকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। কিন্তু এই বিফলতাও তাহাদিগকে নিরুৎসাহ করিতে পারিল না। তাহারা খুঁজিতে লাগিল। গুরুতর পরিশ্রমের ফলে হঠাৎ একদিন তারাকান্ত প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল। সে আর চলিতে পারিল না। অনন্যোপায় হইয়া তাহারা পানসী বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিল। শৈলবালার ঐকান্তিক পরিচর্য্যায় তারাকান্ত দুই তিন দিনের মধ্যেই রোগমুক্ত হইল। সেই হইতে তাহারা নৌকাযোগেই ইন্দুমতীকে অন্বেষণ করিয়া আসিতেছে। লৌহ ও চুম্বক; তটিনী ও

লবনাম্বুনিধির আকর্ষণের ন্যায় এ কয়দিনের সংসর্গ ও আকর্ষণ, তারাকান্ত ও শৈলবালার হৃদয় নিকুঞ্জে বহুদিনের সযত্ন সিঞ্চিত প্রীতির লতিকা দুটীকে মুঞ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে।

শৈলবালা, তারাকান্তের হাত হইতে বাঁশীটি কাড়িয়া লইল। পরে, কহিল,

"এই দেখ, তোমাকে মণিহারা ফণি করিলাম।"

তারাকান্ত হাসিল। বলিল,

"পরশমণি আজ আমার বাঁশী ছুঁইয়াছে; বাঁশের বাঁশী সোণার বাঁশী হইল।"

শৈল। একবার সোণাটা পরীক্ষা করিয়া দেখি? তোমার কাছে কষ্টি পাথর আছে?

তারাকান্ত, শৈলবালার হাত হইতে বাঁশীটী পুনঃ গ্রহণ করিল এবং দুই তিনবার অধরের সম্মুখে ধরিল; কিন্তু বাঁশীতে আর তেমন স্বর তরঙ্গ উঠিল না। শৈলবালা তখন সহাস্যে কহিল,

"ছি! ছি! নাগর হা'রলে?"

বাঁশী ছাড়িয়া, তারাকান্ত তখন শৈলবালার সহিত একটু কৌতুক করিতে আরম্ভ করিল। শৈলবালাকে জলে নিক্ষেপ করিবার ছলে, শৈলবালার ভুজযুগল ধরিয়া ধাক্কা মারিল; আবার অমনি টানিয়া ধরিল। শৈলবালাও তারাকান্তকে জড়াইয়া ধরিল। কাজেই শৈল, জলে পড়িল না।

তখন তারাকান্ত দেখিল, তরণীখানা স্রোতের বেগে, অনেক দূর সরিয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি হাইল বাহিয়া, কূলের অভিমুখে

চলিল। কিন্তু, প্রবল-স্রোত বেগ বশত পারের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। ইহা দেখিয়া, শৈলবালা হাসিতে হাসিতে কহিল,

"আমি দাঁড় টানিব, মাঝি মহাশয় ?"

তারাকান্তও শৈলবালার কথা শুনিয়া হাসিল। বলিল,

"মাল্লারাণী, দাঁড় টানিতে হ'বে না। শুধু পালটা টেনে দিলেই হয়। পারিবে ?"

নৌকার মাস্তল উঠান ছিল। একখানি পালও তোলা ছিল। কিন্তু, পালখানা মাস্তলে জড়াইয়া রহিয়াছে। তা দেখিয়া, শৈলবালা কহিল,

"ভয় নেই ; বাহিতে না জানিলে মাঝিগিরি ক'রে কাজ কি ?"

শৈলবালা মাঝিদিগকে পাল তুলিতে দেখিয়াছিল। কাজেই, পাল টানিয়া দিতে শৈলবালার কিছুমাত্র ভাবিতে কি ক্লেশ পাইতে হইল না। অনায়াসে পাল টানিয়া দিল। তরণীখানা তখন অনুকূল বায়ুবেগে, হু হু করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। তারাকান্ত, তরণী বেগে চলিতে দেখিয়া কহিল,

"আমার এরূপ একটী ভাল মাল্লা রাখিতে হইবে ; প্রতিকূল বায়ু কি ঝড়তুফানে পড়িলেও যেন কোন ক্লেশ না হয়।"

শৈলবালা সহর্ষে কহিল,

"এমন নির্গুণ মাঝির কাছে ভাল মাল্লা আসিবে কেন ? আমি যে এসিছি সে কেবল প্রাণের দায়ে।"

তারাকান্ত হাসিল। কহিল,

"মাহিনা বেশী দিলে ঢের ঢের আসিবে। তোমার প্রাণের দায় কি এতই বেশী যে মাল্লাগিরি ক'রে প্রাণ বেচিতে এসেছ।"

শৈলবালা। দায় বেশী বলেই ত এসেছি। অন্যে শুধু মাহিনার জন্য আসিবে না।

তারাকান্ত। কেন, আসিবে না?

শৈলবালা রহস্য করিয়া কহিল,

"নিগুর্ণ মাঝির সঙ্গে থাকিয়া, কে প্রাণ দিতে যাবে? প্রাণের ভয় সকলেরই আছে। বিশেষত তুমি ঝড় তুফানে ভাড়া লইবে না, তাতে পোষাবে কেন?"

তারাকান্ত সকৌতুকে কহিল,

"প্রাণের ভয় কেবল আমাদের শৈলবালার নেই!"

মুহূর্ত্তের ভিতরে তরণী স্বস্থানে আসিয়া পৌঁছিল। তারাকান্ত ও শৈলবালার কথাও মাঝখানে শেষ হইল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—••০••—

সেই দুই জন।

হাসিকারা গ্রামের বহির্ভাগে একটী সুবৃহৎ নিবিড় জঙ্গল। সেই নিবিড় জঙ্গলের ভিতর আবার একটী প্রকাণ্ড অত্যুচ্চ বৃক্ষ। বৃক্ষটি ঘন ঘন শাখা প্রশাখা ও পল্লবে সমাচ্ছাদিত। পাতার আড়ালে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিবার বিশেষ সুবিধা। কাকপ্রাণীও জানিবার উপায় নাই—এত নিবিড়! বৃক্ষের নীচে, একটী বিকটাকার রমণী-মূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। রমণীর গলদেশে মৃত গো মহিষাদির হাড়, ছিন্ন ভিন্ন জুতা ও ভাঙ্গা ঝাঁটার মালা বিজড়িত। রমণীর মুণ্ডিত মস্তক বাহিয়া, দরবিগলিত ধারায় ঘোল পড়িতেছিল। তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বৃক্ষের নিম্নে দাঁড়াইয়া গলবিলম্বিত কঙ্কালাদি উন্মোচন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কঠিন বন্ধন, খুলিতে পারিল না। কিন্তু, উন্মোচনের চেষ্টায় কঙ্কালের ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ শব্দ সমুত্থিত হইতেছিল। সেই শব্দ বৃক্ষের পাতায় পাতায় সংশ্লিষ্ট হইয়া প্রতিধ্বনি করিল। সঙ্গে সঙ্গে মানবকণ্ঠেও উচ্চারিত হইল;—

আয়লো আমার পেত্নীরূপী সোণা,
ডালে ডালে ঘুরবি, খাবি পাকা নোনা!

সহসা নিবিড় জঙ্গলে এই ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণ মাত্র, স্ত্রীলোকটী ঊর্দ্ধদিকে, সুতীক্ষ্ণ নেত্রে চাহিল। দেখিল, একটী লোক পা ঝুলাইয়া ডালে বসিয়া আছে এবং ঈর্ষা-বিস্ফারিত চোখে কটাক্ষ করিতেছে। রমণীর চোখ, লোকটির চোখে চোখে, পড়িবামাত্র লোকটি বিদ্রূপাত্মক ইঙ্গিত করিল এবং একটি ক্ষুদ্র শাখা ভাঙ্গিয়া নীচে ফেলিল। আর শাখাটি ফেলিতে ফেলিতে বিজাতীয় বিকটস্বরে কহিল,

হাড় ঠন্ ঠন্, ঝাটার ঝন্ ঝন্।
কেমন বুঝিস্ পেতনী লো এখন ?

রমণী, স্বর চিনিল—ডাকিল। লোকটি কিন্তু উত্তরও দিল না। কেবল পাতার অন্তরালে থাকিয়া, সজোরে শাখাগুলিকে, ঘন ঘন আন্দোলন করিতে করিতে, আবার বিষম কর্কশকণ্ঠে কহিল,

আয়লো আমার পেত্নীরূপী সোনা,
ডালে ডালে ঘুরবি, খাবি পাকা নোনা।
হাড় ঠন্ ঠন্ ঝাটার ঝন্ ঝন্।
কেমন বুঝিস্ পেতনী লো এখন ?

স্ত্রীলোকটি, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এ বিদ্রূপজনক বাক্য সহ্য করিল। পরে, কহিল,

"প্রতুল, আর ব্যঙ্গ করিও না। তোমার এ ব্যঙ্গ এ সময়ে, আমার অসহ্য !"

স্ত্রীলোকটি আমাদের গৌরমণি। গৌরমণি রায়দের কর্তৃক

ধৃত হইয়া, তৎকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিশিষ্টরূপে লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত ও অপমানিত হইয়াছিল। রায়রাই তাহার গলদেশে কঙ্কালাদির মালা জড়াইয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিয়াছিল। গৌরমণিকে দেখিলেই, লোকে টিটকারী, হাততালি ও বিদ্রূপ করিত। এ সব টিটকারী সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রাণের ভয়ে, এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। সে জানিত না যে, প্রতুল আবার এ বনের ভিতর লুক্কায়িত রহিয়াছে। গৌরমণি, প্রতুলকে গোপনে গোপনে অনেক খুঁজিয়াছিল। আর এ জনমে দেখা হইবে না বলিয়া নিরাশও হইয়াছিল এবং ভাবিয়াছিল, প্রতুলের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহাকে সঙ্গে করিয়া চিরজীবনের নিমিত্ত হাসিকান্না গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরদেশে যাইয়া থাকিবে। কিন্তু গৌরমণির সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। যদিও দৈবাধীন আজ জঙ্গলে সাক্ষাৎ হইল, তথাপি গৌরমণির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না। প্রতুল গৌরমণির কথা শুনিয়া রাগান্বিত হইল। রুষ্টস্বরে কহিল,

"পাপিয়সি, এখান হ'তে দূর হ'——"

প্রতুলও রায়দের উৎপীড়ন-ভয়ে, প্রচ্ছন্নভাবে, এ বৃক্ষে অবস্থান করিতেছিল। প্রতুল, গৌরমণির লাঞ্ছনা-প্রাপ্ত অবয়ব ঈক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইল। ভাবিল, গৌরমণি বুঝি তাহাকেও ধরাইয়া দিতে আসিয়াছে। রায়েদের লোকও তাহার সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে আছে। প্রতুল ভুল বুঝিল। গৌরমণির উদ্দেশ্য তাহা নহে।

প্রতুলের কথায়, গৌরমণির হৃদয়ে আগুন জ্বলিল। অগ্নিস্ফুলিঙ্গমিব নেত্রে বলিল,

"প্রতুল, আমি পাপিয়সী সত্য : কিন্তু তোর ন্যায় অকৃতজ্ঞ পিশাচ নহি।"

প্রতুলের রাগ দ্বিগুণ বাড়িল। সেও প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় প্রদীপিত হইয়া উঠিল। কহিল,

"সয়তানি, আজ তোর অদৃষ্টে কিছু—"

প্রতুল ক্রোধে আর কিছু বলিতে পারিল না।

গৌরমণি তখন ক্রুদ্ধা সাপিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল,

"পোড়ারমুখো, আমার অদৃষ্টে, না তোর অদৃষ্টে?"

ক্রোধোন্মত্ত প্রতুল একটী ডাল ভাঙ্গিয়া, প্রবলবেগে গৌরমণির গাত্রে ছুড়িয়া মারিল। গৌরমণি আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার হৃদয়ে পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা জাগিয়া উঠিল। দন্তে দন্তে ভীষণ ঘর্ষণ করিল। দন্ত কড় মড় করিয়া উঠিল। পরে সক্রোধে বলিল,

"সাবধান! নিতান্তই তোর মরণ ঘটেছে; দেখছি।"

এই বলিয়া, কট মট করিয়া প্রতুলের পানে আবার তাকাইল। পুনরায় প্রতুল সজোরে বৃক্ষের ডাল আন্দোলিত ও মুখ বিকৃতি করিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিল,

"সত্যি, পেতনী; কালমুখী, সত্যি?"

যেমন এই কথা বলিয়াছে, অমনি আন্দোলিত ডাল ভাঙ্গিয়া ডালসহ প্রতুল ভূমিতলে পড়িয়া গেল। গৌরমণি, তৎক্ষণাৎ প্রতুলের

সম্মুখে আসিল। দেখিল, একটী শাখা, প্রতুলের বক্ষ ভেদ করিয়া, পৃষ্ঠদেশ দিয়া নির্গত হইয়াছে; পাঁজর পেটের ভিতর ঢুকিয়া গিয়াছে; হাত পা ভাঙ্গিয়া হাড় বাহির হইয়াছে; শাখা লাগিয়া একটী চোখের তারকা খুলিয়া গিয়াছে: বিদীর্ণ স্থান দিয়া ঝলকে ঝলকে শোণিতস্রাব হইতেছে। প্রাণ ওষ্ঠাগত—যায় যায়।

তখন গৌরমণি, বিকট হাসিয়া উঠিল। গৌরমণির চোখে আগুণ জ্বলিতে লাগিল। সজোরে প্রতুলের বক্ষে পদাঘাত করিল। পরে, বিকৃত-কর্কশ-কণ্ঠে কহিল,

"দেখ্ পোড়ারমুখো, গৌরমণির প্রতিজ্ঞা?"

এই বলিয়া, উপর্য্যুপরি প্রতুলের বক্ষে সজোরে পদাঘাত করিতে লাগিল। রাক্ষসী গৌরমণি! এই কি প্রতিজ্ঞা পালন?

মুমূর্ষু প্রতুল ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,

"আমি মহাপাপী—আমার পাপের উপযুক্ত ফল হইল!"

বলিতে বলিতে প্রতুলের প্রাণবায়ু, পাপদেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। রাক্ষসী গৌরমণিও তখন হাসিতে হাসিতে আরও গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিতে লাগিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভবিষ্যৎবাণী।

"এ কি খেলা ? জলে, বুদ্‌বুদ্ ; স্থলে, ফুলের হাসি। এই উঠে, এই মিলিয়া যায় ; এই হাসে, এই ঝরিয়া পড়ে। অদ্ভুত রহস্য। এ রহস্য কে বুঝিতে পারে ? যে বুঝিতে পারে, সে কেন এ লীলাময় ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে চায় না ? বুঝেছি, এ খেলায় অনন্ত যাতনা। যাতনা সকলে সহিতে পারে না। কাজেই, সকলে এ খেলা খেলিতেও চায় না। এ সমস্ত কি ভাবিতেছি ? আপনার কথা না ভাবিয়া, কি করিতেছি ! যা'ক্ আমার কথাই ভাবি।

"কোথায় এসেছি ? কি হইয়া গিয়াছিলাম ? উন্মত্তবৎ ! সেই অবস্থায় কিন্তু ছিলাম বেশ। এ সংসারের সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ ভাল মন্দ কিছুরই জ্ঞান ছিল না ; মানব জীবনের কোন অভাবই বুঝিতে পারিতাম না ; ইহলোকে যেন আমার কোন সম্পর্কই ছিল না ; কেমন একটানা স্রোতমুখে ভাসমান তৃণখণ্ডের ন্যায় ইন্দুমতীর ভাবনা স্রোতেই জীবন-পুষ্প ভাসিয়া যাইতেছিল। সে জীবনে আর এখনকার জীবনে কত যে প্রভেদ তাহা বলিতে পারি না। ই-

জগতে তাহার তুলনা হয় না! ডুবিয়াছিলাম—পরোপকারী মহাত্মা দয়াবশে আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ডুবিয়াছিলাম ত আবার উঠালেন্ কেন? উঠালেন ত যাহাকে চাই, তাহাকে পাই না কেন? এ উঠার ফল হইল কি? জীবন পাইয়াছি সত্য; কিন্তু জীবনে সুখ শান্তি নাই। কেবল শোকানলের পুনরুদ্দীপ্তি। এখনকার অনল যেন পূর্ব্বাপেক্ষা প্রখর—অসহ্য। ইন্দুমতীর সংশ্রবে যতদিন ছিলাম ততদিন শোক তাপ কিছুই বুঝিতে পারি নাই। ইন্দু আমার হৃদয়ে রাম রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। এখন আমার সেই রাম রাজ্যে বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। অবিরাম হাহাকার, আর্ত্তনাদ, অশান্তির, অনন্ত হিল্লোল বহিতেছে। আর দেখ, সেই নীলাকাশ; সেই বিমল চন্দ্রের সেই শুভ্র জ্যোৎস্না; সেই কাল কোকিলের কোমল কণ্ঠের কুহু কুহু ধ্বনি; আর সেই যমুনার সুস্নিগ্ধ প্রাণ মাতান কুল্ কুল্ রাগিণী; সকলি সমভাবে রহিয়াছে। কিন্তু আমার কিছুই নাই। এ সংসারে যাহার কিছু নাই; তাহার হৃদয়ে যে কত যন্ত্রণা; কে তাহা নির্ণয় করিবে? একের অভাবেই এ জীবন বিষাদময় হইয়া রহিয়াছে। জানি, আমার, সুখের সাগর সুশীতল জলে পরিপূর্ণ। পিপাসায় ওষ্ঠাগত প্রাণ! আকণ্ঠ পুরিয়া পান করিবার নিমিত্ত বারি স্পর্শ করিতে যাই, কিন্তু স্পর্শ করিতে পারি না। দেখি, সাগর বক্ষ যেন সাহারার মরুভূমি! ত্রাসে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। জল থাকিতেও যখন জলপান করিতে পারি না, তখন আর আমার জীবনলাভে ফল হইল কি? আমাকে কষ্ট দেওয়াই কি তাঁহার

ইচ্ছা? আর যে ক্লেশ সহিতে পারি না। জানিনা, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কোন কর্ম্মফলে এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে আজ চিতার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে!" একটী মাটীর উচ্চ ঢিপির উপর বসিয়া আমাদের নরেন্দ্রনাথ এইপ্রকার ভাবিতেছিল।

নরেন্দ্রনাথ যে সময় নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায় ঠিক সেই সময়, একটী পরোপকারী সন্ন্যাসী সেই নদীর ভগ্ন কূল হইতে বহুদূরে স্নান করিতেছিলেন। তিনি নরেন্দ্রকে নদীর আবর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া আসিতে দেখিয়া, নরেন্দ্রনাথকে উত্তোলন করেন। তাহাকে উত্তোলন করিয়া দেখিলেন যে, নরেন্দ্রনাথ অজ্ঞান—মৃতপ্রায়। তখন সন্ন্যাসী নরেন্দ্রকে নিজের স্কন্ধে ফেলিয়া স্বীয় আশ্রমে লইয়া গেলেন। পরে, তিনি বহু শ্রম ও বহু প্রক্রিয়া করিয়া তাহার জীবন দান করেন। এবং কিছুদিন নিজের আশ্রমে রাখিয়া সুস্থ ও প্রকৃতস্থ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ সুস্থ হইয়া আশ্রমেই কিছুদিন ছিল। আশ্রমে অবস্থান কালে নরেন্দ্রনাথ, ইন্দুকে যে বিনা দোষে, প্রতুল ও গৌরমণির কুচক্রান্তে পড়িয়া পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ইন্দুমতীর অন্বেষণার্থ অনিদ্রা, অনাহার জনিত চিন্তা ও ভাবনায়ই যে তাহার চিত্তবিকৃতি হইয়াছিল, এ সমস্ত বিষয় একে একে সন্ন্যাসীর নিকট অকপটে বিবৃত করিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া, সন্ন্যাসী নরেন্দ্রের প্রতি বিশেষ দয়ার্দ্র হইয়া, নিজে ইন্দুমতীর অন্বেষণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু, নিজের সুখের নিমিত্ত, মহাপুরুষকে ক্লেশ দেওয়া অসঙ্গত বোধে, তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া, সন্ন্যাসী ঠাকুরকে না বলিয়া, নিজেই ইন্দুমতীর অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছে। এবং

অন্বেষণ করিতে করিতে, পরিশ্রান্ত হইয়াই উচ্চ মাটির ঢিপির উপর বসিয়া ভাবিতেছিল।”

যাহাহউক, নরেন্দ্রনাথ, কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া, তথা হইতে উঠিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিল। দুইদণ্ডকাল বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল। আর কিছুদূর অগ্রসর হইলেই যেন ইন্দুমতীকে পাওয়া যাইবে; এই প্রবল আশায়, আগ্রহের সহিত হাঁটিতে লাগিল। পথশ্রমেও ক্লান্তি বোধ করিতেছিল না। এতটুকু আর এতটুকু—ঐ যে দূরে গ্রামখানি ধূ ধূ ধূ ধূ দেখা যাইতেছে; আর ঐ যে প্রান্ত শূন্য প্রকাণ্ড মাঠ ধূ ধূ ধূ ধূ করিতেছে, উহা পার হইতে পারিলেই যেন ইন্দুমতীকে পাইতে পারিবে, বক্ষে রাখিয়া, এ পথশ্রম দূর করিবে; চিরদিনের মত সুখের মুখ দেখিবে। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে কত পথ অতিক্রম করিয়াছে; এবং কত বিস্তীর্ণ মাঠ, ত বিস্তীর্ণ গ্রাম অবহেলায় লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছে—সংখ্যা নাই। বহুদূরে ঐ যে একটী বৃক্ষ ধূ ধূ ধূ ধূ দেখা যাইতেছে, সেই বৃক্ষটী দেখিয়া ভাবিতেছে—ঐ বৃক্ষের অন্তরালেই বুঝি ইন্দুমতী তাহাকে দেখিয়া প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। নরেন্দ্র এইরূপ ভাবিতেছে, আর বৃক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। আস্তে-আস্তে, ধীরে, অতি সন্তর্পণে পা ফেলিতেছে। ভয়—পাছে কোন প্রকার সাড়া শব্দ পাইয়া, ইন্দুমতী পলাইয়া যায়। কিন্তু হায়! বৃক্ষের সন্নিধানে আসিয়া, ইন্দুকে দেখিতে পাইতেছে না। দেখিতে না পাইয়া নিরাশায় ভগ্নোৎসাহ হইতেছে এবং ভগ্ন-হৃদয়ে চারিদিকে শূন্যগর্ভ দৃষ্টিপাত করিতেছে। কখনও নরেন্দ্রর চোখের জল কপোল বাহিয়া অবিরল

ধারায় পড়িতেছে; কখনও অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে, দীর্ঘ নিশ্বা ছাড়িতেছে আর হাঁটিতেছে।

অকস্মাৎ নরেন্দ্রর পশ্চাৎভাগে সেই প্রান্তর মধ্যে মনুষ্যকণ্ঠে যেন বলিয়া উঠিল,

"নরেন্দ্র, কি দেখিতে চাও?"

নরেন্দ্র মুহূর্ত্ত মধ্যে বিশ্ব সংসার খুঁজিল। খুঁজিয়া দেখিবা উপযুক্ত জিনিষ পাইল না। অবশেষে হৃদয় খুঁজিল: খুঁজিয়া পাইল ইন্দুমতীর মুরতি। অমনি বলিয়া উঠিল,

"ইন্দুমতীকে।"

সেই কণ্ঠে উচ্চারিত হইল,

"ইন্দুমতীর চরিত্রের প্রতি তোমার বিশ্বাস আছে?"

নরেন্দ্রনাথ অম্লান বদনে কহিল,

"খুব আছে।"

আবারও সেই কণ্ঠ, গভীর স্বরে কহিল,

"সাবধান! এখনও বলি, আবার মনের সঙ্গে বুঝিয়া দেখ তুমি—"

নরেন্দ্র বিরক্ত হইল। কথায় বাধা দিয়া, ব্যগ্রতার সহি কহিল,

"মনের সঙ্গে মিলাব, কি ছাই ভস্ম! বলুন, ইন্দু কোথা আছে?"

অন্তরীক্ষ হইতে সেই কণ্ঠ হাসিল। কহিল,

"তুমি পাগল, এত ব্যগ্র হইলে চলিবে কেন?"

নরেন্দ্র রাগিল। অতিশয় কর্কশ স্বরে কহিল,

"তুমি মানুষই হও; আর দেবতাই হও, তোমার ন্যায় কাপুরুষ ার এ জগতে নাই। তুমি গোপনে থাকিয়া আমার সহিত বঞ্চনা করিতেছ; সম্মুখে পাইলে তোমার মাথার খুলি ভাঙ্গিতাম। খিতে, নরেন্দ্রের বাহুতে কত বল ধরে।"

অন্তরীক্ষ হইতে পুনরায় প্রশান্তস্বরে কহিল,

"বৎস নরেন, যাহার হৃদয়ে সহিষ্ণুতা নাই, সে কি মানুষ?"

নরেন্দ্রের মোহ ভাঙ্গিল। বোধ হইল, যেন এ স্বর কোথাও নিয়াছে। অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু চিন্তা রিতে করিতে কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না। অনুমান রিতে না পারিয়া, কাতর ভাবে কহিল,

"আমি নরাধম, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনার য়ে পড়িতেছি, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ইন্দুমতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ইবার উপায় বলিয়া দিন্। নচেৎ এখনি নদী জলে এ দগ্ধ াণ বিসর্জ্জন করিব।"

"প্রতিজ্ঞা করিতে পারিবে?"

"পারিব।"

"প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিবে না?"

"প্রাণ থাকিতে কখনও না।"

"কখনও আর ইন্দুকে পরিত্যাগ করিবে না?"

"না।"

তখন অন্তরীক্ষ হইতে ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল। বলিল,

"বৎস নরেন্দ্র, অনতিদূরে কন্‌কন্‌ গ্রামে একটি ভগ্নপ্রাসাদ আছে। সেখানে গেলেই ইন্দুমতীকে দেখিতে পাইবে। ইন্দুর পবিত্র হৃদয়, অযত্ন করিও না।"

স্বর থামিল। নরেন্দ্রনাথ দেখিল, তাহার সম্মুখে শিবতুল্য এক মহাপুরুষ দণ্ডায়মান। দেখিয়াই চিনিল এবং বলিয়া উঠিল

"এ কি! একি! ঠাকুর, তুমি, তুমি, তুমি!"

এই বলিয়া নরেন্দ্রনাথ মূৰ্চ্ছিত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সেই মহাপুরুষের পাদমূলে ছিন্ন তরুর ন্যায় পড়িয়া গেল। তখন সেই বিরাটপুরুষও অন্তর্হিত হইলেন।

এই মহাপুরুষই নরেন্দ্রনাথের জীবন দাতা।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মৃত্যু শয্যায়

সামান্য একখানা বাড়ী। বাড়ীতে মাত্র একখানা ঘর। ঘরখানার সমস্তই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। চালে খড় নাই; বেড়ায় আবরণ নাই—খুলিয়া পড়িতেছে; দরজায় কপাট নাই। ঘরের কোণে, যেখানে সেখানে ঝুল পড়িয়াছে। ঘরের ভিতর বিশৃঙ্খলভাবে খান কতক তৈজসপত্র রহিয়াছে। সেগুলি আবার ভাঙ্গা চুরা। কোন খানায় দাগ ধরিয়াছে; কোন খানায় ময়লা পড়িয়াছে। কোন খানার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কোন খানা বা অপরিস্কৃত ও অমার্জ্জিতাবস্থায় রহিয়াছে। বাড়ীময় ভয়ানক দুর্গন্ধ। নরক হইতেও যেন বেশী। ঘরের ভিতর ততোধিক। সেই নরক তুল্য ঘরটার ভিতর ছিন্ন ভিন্ন কাঁথার বিছানায়, একটি রমণী পড়িয়া আছে।

রমণীর ভীষণ আকৃতি। শরীরের সমস্ত হাড় বাহির হইয়াছে; সারি সারি শির উঠিয়াছে; বর্ণ পাংশে হইয়া গিয়াছে; গাল ভাঙ্গিয়া, হাড় উঠিয়া, মুখের আকৃতি ভীষণ হইয়াছে; চক্ষু কোটরে বসিয়া গিয়াছে; কিন্তু মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। সে চোখে অবিশ্রান্ত জল পড়িতেছে; মাঝে মাঝে ভীতিব্যঞ্জক

দৃষ্টিপাত করিতেছে; ক্ষীণ কণ্ঠ। রমণীর প্রাণ যায় যায়। ক্ষণে ঈষৎ জ্ঞানের বিকাশ, ক্ষণে তন্দ্রা। জ্ঞানাবস্থায় পাশ ফিরাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। এমন যন্ত্রণা হইয়াছে যে, নড়িতে চড়িতেও যেন প্রাণ যায় যায়। তন্দ্রাবস্থায় রমণী দেখিল, সে যেন উত্তাল-তরঙ্গান্দোলিত কালসাগরে পড়িয়াছে। কিন্তু, আশ্রয় পাইতেছে না। গভীর কালসাগর; নাই কূল, নাই কিনারা —অকূল সাগর। আশ্রয় কোথায় পাইবে? সাগরের-উত্তাল-তরঙ্গ মালা মাথার উপর দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া যাইতেছে। রমণীর নাসারন্ধ্রে, মুখে, চোখে, কর্ণ কুহরে হু হু করিয়া সেই জল প্রবেশ করিতেছে। প্রচুর জল খাইতে খাইতে পেট ফুলিয়া উঠিয়াছে; সাগরে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছে; এক নিশ্বাস প্রশ্বাস ছাড়িতে না ছাড়িতেই তরঙ্গের পর তরঙ্গ, ক্রমান্বয়ে আসিতেছে—যাইতেছে। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—অবিশ্রান্ত চলিয়াছে। রমনী মাঝে মাঝে টেনে টেনে, হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে, অনেক কষ্টে, দুই একবার নিশ্বাস প্রশ্বাস ছাড়িতেছে, তরঙ্গের আবর্ত্তে আবর্ত্তে ডুবিতেছে—উঠিতেছে; আবার ডুবিতেছে—আবার উঠিতেছে। সে যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছে।

সহসা রমণী আবার দেখিল, সেই উত্তাল তরঙ্গের ভিতর একখানা ক্ষুদ্র তরণী—সুন্দর ভাসিতেছে। এত যে তরঙ্গ তবুও তরণীখান স্থির—নিশ্চল। সেই তরণীতে আবার কতকগুলি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি। ঐ মূর্ত্তিগুলির প্রত্যেকের হস্তে, এক একটা অর্দ্ধ দগ্ধ বংশ খণ্ড। সেই বিকটাকার মূর্ত্তিগুলি, হস্তস্থিত বংশখণ্ড দিয়া, তরণী বাহিয়া বাহিয়

রমণীর সম্মুখে আসিল। আসিয়াই একখণ্ড বংশ রমণীর অতি নিকটে ফেলিয়া দিল। রমণী, সেই বংশখণ্ড ধরিবার নিমিত্ত হাত তুলিল। বংশখণ্ড ধরে ধরে, এমন সময় একটী মূর্ত্তি হি হি করিয়া হাসিয়া, বংশখণ্ড তুলিয়া লইল। রমণী, আশ্রয় বিহীনা হইয়া, উপর্য্যুপরি হাবু ডুবু খাইতে লাগিল। হাবু ডুবু খাইতে খাইতে, রমণী অনুমান করিল—তাহার প্রাণ যেন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রকৃতই যেন সে মরিয়া গিয়াছে। মরিয়া গিয়াছে তবুও তার শান্তি নাই। তবুও সে দেখিতেছে, তাহার মৃত দেহটা জলে ফুলিয়া গিয়াছে; সেই স্ফীত বিশ্রী দেহটা ভাসিতে ভাসিতে তীরে সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কতকগুলি কুকুর, শৃগাল, শকুনি, ও কাক যেন দেহটাকে টানিয়া ছিঁড়িতেছে—ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। রমণী, এসব দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে।

রমণী আরও দেখিল, কিয়ৎকালপর, সেই বিকটাকার লোকগুলি স্কন্ধে করিয়া যেন তাহার প্রেতাত্মাকে লইয়া চলিল। কোথায়? ক্রমশ অন্ধকারে। যত অগ্রসর হয়, ততই যেন ঘন অতিঘন অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিতেছে। সেই আঁধার ভেদ করিয়া, কিছুই দেখা যায় না। এত ঘন অন্ধকার যে, লোক প্রাণীও থাকিতে পারে না। অন্ধকারের উপর অন্ধকার। গাঢ়, গভীর ভীষণ অন্ধকার। অন্ধকার যেন দিগন্ত ব্যাপিয়া আছে। বামে, দক্ষিণে, উচ্চে, নীচে, সম্মুখে, পশ্চাতে অন্ধকার ছুটিতেছে—ভ্রূকুটি করিয়া নাচিতেছে—প্রবাহিত হইতেছে। সহসা সেই নিবিড়, ভীষণ, দুর্জ্জয়, অন্ধকারের ভিতর একটুকু বিদ্যুৎ চমকিল। রমণী,

তাহাতেই পুনরায় দেখিল, সম্মুখে অনলোপরি তেলপূর্ণ প্রকাণ্ড লৌ কটাহ। টগ্‌বগ্‌ করিয়া তেলগুলি ফুটিতেছে, ওতপ্রোতভাবে ক্রীড় করিতেছে। সেই সুতীব্র উত্তপ্ত কটাহে মানুষ পড়িবামাত্র মুহূর্ত্তমধে ভস্মীভূত হইয়া যায়। কটাহের চারিদিকে ভীষণ ভীম কতকগুলি লোক অনল সদৃশ্য উত্তপ্ত লৌহ শলাকা লইয় বসিয়া আছে। রমণীকে দেখিবামাত্র, সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বিশিষ্ট লোকগুলি উল্লাসে মাতিয়া উঠিল এবং রমণীর প্রেতাত্মাকে ছিনাইয়া নিয়া, সেই উত্তপ্ত তেলের ভিতর ঝনাৎ করিয় ফেলিয়া দিল। পরে, হস্তস্থিত সেই অনল তুল্য লৌহ শলাক দ্বারা তেলের ভিতর ডুবাইয়া ধরিল। রমণী চিৎকার করিয় উঠিল—"উঃ! প্রাণ যায়, উঃ! প্রাণ যায়, রক্ষা কর, রক্ষা কর।" আর ব্যাকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিল। সেই কাতরোক্তি কেহই শ্রবণ করিল না। বরং, সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিগুলি রমণীকে দেখিয় দন্ত বিস্ফারিত করিয়া বিকট হাসিতে লাগিল।

আবার বিদ্যুৎ চমকিল। আবার দেখিল, কটাহের নিকট প্রতুল যেন দাঁড়াইয়া আছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেও হাসিতেছে, কাতরোক্তি শুনিয়া টিক্‌কারী দিতেছি, হাততালি দিয়া নৃত্য করিতেছে। রমণী প্রতুলকে দেখিয়া প্রাণ রক্ষার্থ যাচ্ঞা করিল। প্রতুল সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ভ্রুকুটি-কুটিল-নয়নে চাহিতে লাগিল।

অকস্মাৎ গৌরমণির তন্দ্রা ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখিল—নিকটে কেহই নাই। ভীষণ ভয়ে, শরীর থর থর কাঁপিয়া উঠিল। কাঁপিতে কাঁপিতে আবার মূর্চ্ছিতা হইল—আবার সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—[০]—

ভগ্ন প্রাসাদে।

কনকন্ গ্রামে বহুকালের পুরাতন একটী ভগ্ন প্রাসাদ বর্ত্তমান। প্রাসাদটী নিবিড় জঙ্গলাবৃত, নানাবিধ খাদ্য ও অখাদ্য বৃক্ষে জড়ীভূত, সেই বৃক্ষগুলি আবার লতা গুল্মে সমাচ্ছাদিত। মনুষ্য সমাগম রহিত। কিছুদিন হয় সেই প্রাসাদে আসিয়া একটী জীর্ণা শীর্ণা রমণী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সেই রমণীর হাড়ে মাংস লাগিয়াছে; উদরের, বক্ষের ও পৃষ্ঠের হাড়গুলি দেখা দিয়াছে। রমণীর কুটিলকুন্তলগুচ্ছ—রুক্ষ; পরিধানে, শতগ্রন্থি বিশিষ্ট ছিন্ন ভিন্ন কাপড়; সর্ব্বাঙ্গ, ধুলি ধুসরিত। রমণী, আহারার্থ গ্রামে যায় না; প্রাসাদস্থ বৃক্ষের ফল খাইয়াই জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

সন্ধ্যাদেবী, পরিহিত কৃষ্ণ বসনে, উদয়োন্মুখিনী। সেই কৃষ্ণ বসনের ছায়া বৃক্ষে, লতায় পাতায় পড়ে পড়ে হইয়াছে। এমন সময়, সেই রমণী, সেই প্রাসাদস্থ কক্ষের একটা বাতায়নে আসিয়া বসিল। বাতায়নের সম্মুখে একটী বেল ফুলের গাছ। গাছটিতে

প্রচুর পরিমাণে ফুল ফুটিয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, ফুলগুলি যেন খল্‌খল্‌ করিয়া হাসিতেছে। রমণীর নিকট ফুলের এ হাসি বড় ভাল লাগিল। কিন্তু রমণী দেখিল, একটী প্রস্ফুটিত ফুল তখন ঝরিয়া পড়িল। ফুলটি ঝরিতে দেখিয়া, রমণী ভাবিতে আরম্ভ করিল। ভাবিল, মুকুল, সবে ফুটিলে—হাসিলে, আবার হাসিয়াই বৃন্তচ্যুত হইলে কেন? তোমার কচি বয়স, হাসিমাখা ফুটন্ত মুখখানি, সুকোমল দেহ, লাবণ্য, সৌন্দর্য্যে ঢল ঢল করিতেছিলে; কিছুকাল থাকিলে না, কাহাকে আপনার সৌন্দর্য্য দেখিতে দিলে না; আপনি ফুটিলে আপনি আবার ঝরিয়া পড়িলে কেন? আর কিছুকাল থাকিয়া, ঝরিয়া পড়িলে দোষ ছিল কি? তুমিও কি আমার ন্যায়, কাহার প্রাণে কষ্ট দিয়া, পরিত্যজ্য হইয়াছ? সামান্য এক আধ ঘণ্টার নিমিত্ত হাসিলে কেন? এ হাসিতে সুখ কি? বরং কিছুকাল থাকিয়া—নিজে হাসিয়া—একজনকে হাসাইয়া চলিয়া যাইতে. তাতে পরম সুখ হইত। এই আসিলে, এই গেলে কেন? তোমার কোমল মরমে কি কোন প্রকার অসহ্য বেদনা পাইয়াছ? বেদনা পাইলেই কি একবারে ঝরিয়া যাইতে হয়? আমি ত যাতনা পাইয়াও আশায় রহিয়াছি। তুমি কেন থাকিলে না? বুঝেছি, তুমি জীবনের চঞ্চলতা বুঝাইতে আসিয়াছিলে। মেঘ চঞ্চল; ফুল, তুমিও চঞ্চল; বিদ্যুৎ, তরঙ্গ সকলি চঞ্চল! আমার প্রাণও নিয়ত সচঞ্চল! তবে কেন এ প্রাণ যায় না? ফুল, তুমি যে পথে গেলে, আমার দুঃখময় জীবনও সে পথে যায় না কেন? ছি! আমি তোমার ন্যায় নির্জ্জনে মরিতে ভালবাসি না। মরিব তো সেই পদে। যে

সেই পদে মরিতে পারে, সে অনন্তকাল স্বর্গভোগ করে।" আমার কি তেমন অদৃষ্ট হইবে?

ইন্দুমতী তখন একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। গণ্ডস্থলে মুক্তালহরী খেলিতে লাগিল। আঁখিজল মুছিয়া, আবার ভাবিতে আরম্ভ করিল। ভাবিল, এখন তিনি কোথায়? আমাকে কি স্মরণ করেন? আমি কলঙ্কিনী, আমাকে কেন স্মরণ করিবেন? বোধ হয়, বিস্মৃত হওয়ার জন্যই চেষ্টা করিতেছেন। গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অবধি একদিনও ত চিত্ত সুস্থির বোধ হইল না; এ তাপিত পরাণ, সর্ব্বদা কেমন কেমন উদাস্ উদাস্ করিতেছে। এ কষ্টের কি শেষ নাই? তিনি নবকিশলয় পরিশোভিত তরুতলে বসিতে ভালবাসিতেন। চাঁদ উঠিলে, চাঁদের কলঙ্ক নিয়া কত রহস্য করিতেন; তারা ছুটিতে দেখিলে বলিতেন, "ইন্দু, সত্বর গৃহের ভিতর যাও। ঐ দেখ, চাঁদ, তোমার ইন্দুনিভানন দেখিয়া, ঈর্ষার বশীভূত হইয়া তোমাকে লইতে স্বর্গদূত প্রেরণ করিয়াছেন।" "বউ কথা কও" পাখী ডাকিলে, হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "ইন্দু, সাবধান! কখনও কথা বলিও না; দেখিব, পাখীটা তোমাকে কত সাধিতে পারে।" কথা বলিতে গেলে, অমনি তাঁহার সুস্নিগ্ধ করতল দ্বারা আমার মুখখানি চাপিয়া ধরিতেন। কিছুতেই কথা বলিতে দিতেন না। তিনি ফুলের হাসি দেখিতে পারিতেন না। বলিতেন, "ফুল, তোমাদের হাসি হইতেও যে ইন্দুর হাসি সুন্দর।" আমি মরমে মরিয়া যাইতাম। হায়! এখনও ত নবকিশলয় পরিশোভিত কত তরুশ্রেণী দেখিতেছি; কিন্তু, কৈ তাঁহাকে ত দেখি না? আর

এখনও চাঁদে কলঙ্ক আছে; এখনও তারা ছুটে; 'বৌ' পাখী ডাকে; ফুল হাসে; কিন্তু তিনি ত আর তেমন করিয়া, হতভাগিনীকে কিছু বলেন না?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, পুত্র শোকাতুরা মাতার যেমন চিত্ত চাঞ্চল্য, ঔদাসীন্য ও চঞ্চলদৃষ্টি জন্মে, ইন্দুমতীর অবস্থাও তেমনি ঘটিল। ইন্দুমতীর পবিত্র হৃদয়-সাগর, নরেন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ-জনিত শোকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; উন্মনস্কভাবে ইতস্তত ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিতে লাগিল; চোখের জলে, ইন্দুমতীর পীনোন্নত বিশাল বক্ষে এক অভিনব বেগবতীর সৃষ্টি হইল। মধ্যে মধ্যে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। কিয়ৎকাল, এই ভাবে অতিবাহিত হইল। ক্রমে চিত্তচাঞ্চল্য কিঞ্চিৎ উপশম হইয়া আসিল। তারপর আবার ভাবিল, খুব বেশ কার্য্য করিয়াছি। এখন আছিও একপ্রকার ভাল। আমার নিমিত্ত শৈলবালা কষ্ট ভোগ করিবে কেন? আমিই না তাহাকে কষ্ট দিব কেন? তাহাকে না বলিয়া আসিয়াছি, ভালই করিয়াছি; বলিয়া আসিতে পারিতাম না। শৈলবালা যে সে শৈলবালা নহে। সে পরের কষ্ট দেখিতে পারে না। আপনার দুঃখ, যাতনা, প্রাণের ব্যথা ঢাকিয়া রাখিয়া পরের দুঃখ মোচন করিয়া থাকে। এমন শৈলবালাকে বলিয়া আসিতে পারিতাম কি? কখনই নহে। বলিয়া আসিতে গেলেই, কত কথা, কত কি বলিয়া মন ফিরাইয়া ফেলিত। না বলিয়া আসিয়া ভালই করিয়াছি। শৈলবালা এখন সুখী হইতে পারিবে। সে তাহার সুখের পথ এখন নিজেই খুঁজিয়া লইবে। আমি

তাহার সুখের পথে কণ্টক হইয়াছিলাম। পরমেশ্বরের নিকট-কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করি, শৈল যেন আজিই সুখের মুখ দেখিতে পায়। আমার সঙ্গে থাকিলে, শৈলবালার কেবল জ্বালাতনই উপভোগ করিতে হইত। নিজের সুখ সম্ভোগের ও স্বার্থের নিমিত্ত পরকে ক্লেশ দেওয়া কি উচিত ? শৈলবালা কি আমার জন্য কম কষ্ট স্বীকার করিয়াছে ? আমার দুঃখ ঘুচাইবার নিমিত্ত আহার নিদ্রায়, ঝড় তুফানে, শীতগ্রীষ্মে তাহার মনস্তাপ জন্মাইতে পারে নাই। কিসে আমি সুখে থাকিব, এই চিন্তাই অবিরত করিয়াছে ; এত যে কষ্ট পাইয়াছে, তবুও একবার আপনার সুখ দুঃখের কথা ভাবে নাই। ধন্য, শৈলবালার পরোপকার ব্রত জীবনে। ভগবান অবশ্য তাহার মনোরথ পূর্ণ করিবেন।

সহসা, একটা কুমীরাপোকা, আর একটা পোকা মুখে করিয়া ইন্দুমতীর পায়ের কাছ দিয়া, ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। ইন্দুমতীর হঠাৎ সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। এবং যেই পোকাটিকে ধরিতে যাইবে, অমনি কুমীরাপোকাটি উড়িয়া গেল। ইন্দুমতী, কুমীরাপোকাটিকে উড়িতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে পোকাটীকে অঞ্চলের আঘাতে মাটিতে ফেলিল।

কুমীরাপোকাটি তখন অন্য পোকাটীকে ছাড়িয়া দিল। ছাড়িয়া দিয়া ইন্দুমতীর চারিদিকে উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিতে লাগিল। ইন্দুমতী অন্য কীটটিকে পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইল এবং সেটীকে হস্তে করিয়া নানা প্রকার যত্ন করিতে লাগিল। কখনও চুনো দিতে লাগিল, কখনও বা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু,

পাঠ সমাপন করিয়া ভূমিতলে পতিত হইয়া নরেন্দ্রের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া উঠিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করিল। মাথার নীচে একখানা ইট দিল। কারণ, কক্ষে আর কিছুই ছিল না; থাকিবার মধ্যে কেবল, কক্ষের এক পার্শ্বে কতকগুলি ফল পড়িয়া রহিয়াছে। বোধ হয়, এই সঞ্চিত ফলেই ইন্দুমতীর প্রাণ রক্ষা হয়। এই ভগ্ন প্রাসাদে আসিয়া অবধি ইন্দুমতী ভূমি-শয্যায়ই শয়ন করিয়া থাকে।

ইন্দুমতী শয়ন করিল বটে, কিন্তু নিদ্রার পরিবর্ত্তে তাহার অহর্নিশ যে ভাবনা, যে চিন্তা, ইন্দুমতী আবার সেই ভাবনা ও সেই চিন্তায়ই অভিভূতা হইল। ভাবিল, আর যে সহ্য করিতে পারি না। নরেন্দ্র, এ চিরকাঙ্গালিনীকে কি আর তোমার শ্রীচরণে স্থান দিবে না? তুমি ভিন্ন ত্রিসংসারে যে আমার আর কেহ নাই। তুমিই আমার জপ তপ, তুমিই আমার মন্ত্র তন্ত্র, তুমিই আমার ধ্যান ধারণা, আর তুমিই আমার ইহকাল পরকাল [illegible] আর কিছু জানি না। বড় আশা ছিল—তোমার অর্চ্চন পূজা করিয়া ধন্যা হইব। কিন্তু, বিধি বাদ সাধিয়াছেন। বিধি [illegible]ন কি সে সাধ আবার পূর্ণ হইতে পারে না? তোমারই [illegible] ত্ব দেখিতেছি, দিনের পর রাত, আবার রাতের পর দিন এ অভাগিনী কি দোষ করিল? আমার কপাল মন্দ! তাই [illegible], আমার হৃদয় সর্ব্বস্বের সেই পবিত্র সর্ব্বতীর্থ স্বরূপ পাদপদ্মে দাসীর স্থান হইবে না? যে ডাল ধরি, সেই ডালই ভাঙ্গিয়া যায় [illegible]খানে আর কতকাল থাকিব? যাই বা কোথায়? কি করি

ক্ষ ... তী।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, ইন্দুমতীর কমলায়তলোচনে যমুনা বহিল,—প্রাণ কাঁদিল; শরীর অবশ ও জড়িত হইয়া আসিতে লাগিল। আর ইন্দুমতীর বোধ হইল, তাহার হৃদয়ে, বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে, পশ্চাতে উচ্চে, নীচে, কেবলি যেন নরেন্দ্রনাথের ছায়াময় মূর্ত্তি। কিন্তু, সেই মূর্ত্তি অপরিস্ফুট—অপ্রদীপ্ত—যেন কেমন কেমন হাত দেখে ত পা দেখে না, মুখমণ্ডল দেখে ত শরীর দেখে না একটী দেখিলে আর একটী দেখিতে পায় না। এই অবস্থায়, ইন্দুমতীর অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল।

কিন্তু, যতই একাগ্রচিত্তে নরেন্দ্রের বিষয় ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার প্রাণে গভীর তন্ময়তা জন্মিল। ইন্দুমতীর হৃদয়ে নরেন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি জাজ্বল্যমান প্রদীপ্ত হইল। ইন্দুমতী, সেই মূর্ত্তি দেখিয়াও নির্ব্বিকার—স্থির—অচল। ইন্দুর নাই হাসি, নাই হর্ষ। ইন্দুমতী নরেন্দ্রনাথে তন্ময়। সেই তন্ময়াবস্থায় কেবল বলিয়া উঠিল হা "নরেন্দ্র, হা নরেন্দ্র।"

যখন ইন্দুমতী ভক্তি-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নরেন্দ্রের ধ্যান করিতেছি[ল], তখন একটী লোক পায়ের আঙ্গুলের মাথায় ভর দিয়া, খুব টিপিয়া টিপিয়া খুব সাবধানে ও সন্তর্পণে প্রাসাদে[র] একটী উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে উঁকি দিয়া, এ সম[স্ত] দেখিতেছিল। তখন চাঁদের কোমল মধুর কিরণ, বৃক্ষের পা[তা] ভেদ করিয়া, অল্প অল্প কক্ষের ভিতরে পতিত হইয়াছিল। সে[ই] কিরণে কক্ষটী একটু আলোকিত হইয়াছিল এবং কক্ষে[র] সমস্তই একরূপ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল।

যাহাহউক, ইন্দুমতী যতই "হা নরেন্দ্র, হা নরেন্দ্র" বলিয়া কাতরোক্তি প্রকাশ করিতেছিল, লোকটীর বক্ষ যেন ততই ক... দুই খণ্ড হইয়া যাইতেছিল। আর অবিশ্রান্ত নয়নাশ্রু ঝরিতেছিল। লোকটী সেই কাতরোক্তি শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে ইন্দুমতীর বক্ষ ফাটিয়া, হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া, পাঁজর ভাঙ্গিয়া নরেন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ-জনিত শোক উদ্দীপ্ত হইতেছিল। লোকটী এসব বুঝিতে পারিয়া, পুনরায় অত্যন্ত পা টিপিয়া টিপিয়া, খু... সাবধানে একবারে কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া অতি সহজে দেখিল, রমণীর চিরপ্রফুল্ল বদন সরোজ বিষণ্ণ কপোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে, শরীর শীর্ণ, হাড়ে মাংস লাগিয়া গিয়াছে, লাবণ্যবিভার চিহ্ন মাত্র নাই। শুষ্ক মৃণালবৎ দেহখানি

সেই সময়, ইন্দুমতী তন্ময়াবস্থাতেই বলিল,

"ভগবন্, সেই তারা, সেই চাঁদ, সেই আকাশ, সেই সব— সেই সব। কিন্তু—"

লোকটী ইন্দুমতী হইতে একটু দূরে ছিল। এ কথা শুনিয়া অতি সন্তর্পণে আরও প্রায় দুই পা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইল। ইন্দুমতী আবার বলিল,

"সেই ইন্দু, আর এই ইন্দু কত প্রভেদ?"

ইন্দুমতী টের না পায়, এমতভাবে লোকটী আর এক পা অগ্রবর্ত্তী হইল। অতি ধীরে ও অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে বলিল,

"স্বর্গ আর মর্ত্ত!"

এ কথাতে ইন্দুমতীর তন্ময়তা ভাঙ্গিল না। বলিল

ইন্দুমতী।

"স্বর্গে মর্ত্তে সম্বন্ধ নেই কি?"

পূর্ব্বের ন্যায় লোকটী আবার দুই পা অগ্রসর হইল। আবার অতি শান্ত ও কোমলভাবে বলিল, "আছে।"

এই বলিয়াই লোকটী আর একটু অগ্রবর্ত্তী হইল। এখন লোকটী ইন্দুমতীর মস্তকের অতি সন্নিকটে। সহসা ইন্দুমতীর দক্ষিণ হাতখানা, লোকটীর পায়ের উপর পড়িল। পড়িবা মাত্র, "বড় শীতল—বড় শীতল, এ যে আমার নরেন্দ্রের পায়ের ন্যায় শীতল!" এই বলিয়া চমকিয়া উঠিল। তন্ময়তা ভাঙ্গিল। চাহিল—দেখিল, সম্মুখে নরেন্দ্রনাথ দণ্ডায়মান।

তখন ইন্দুমতীর হৃদয় কাঁপিল, প্রাণ কাঁপিল, সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল, মুখে একটী কথাও ফুটিল না। কি যে তখন করিতে কি বলিতে হইবে তাহাও বুঝিতে পারিল না। বুঝিতে না পারিয়া, নরেন্দ্রনাথের পদদ্বয় বক্ষে ধারণ করিল। পরে, সকাতরে প্রাণের আবেগে কহিল,

"নরেন্দ্র, এত দিন পরে—"

আর বলিতে পারিল না। প্রাণ ফাটিয়া এই কয়টী কথাই বাহির্গত হইল এবং উদ্বেলিত প্রাণে কাঁদিতে লাগিল।

নরেন্দ্রনাথ ও ইন্দুমতীর কথায় কোন উত্তর দিতে পারিল না। কেবল ইন্দুমতীকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া, বক্ষের ভিতর টানিয়া লইল ইন্দুমতীও তখন উঠিয়া বাহু পাশে নরেন্দ্রনাথকে জড়াইয়া ধরিল। তখন তাহাদের প্রাণের ভিতর কি যে ভাবের উদ্রেক হইল তাহা লেখা যায় না, বলা যায় না—প্রাণে ফুটে না। তাহ

অব্যক্ত-অনির্ব্বচনীয় ! তাই, বোধ হয়, উভয়ের সংমিলিত বিশাল বক্ষঃস্থল, উভয়ের সংমিলিত অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কাহার মুখে কোন কথা ফুটিল না ; কেহ কাহার পানে চাহিতে পারিল না। কেবল সেই অশ্রুবিন্দুই যেন তাহাদের প্রাণের মর্ম্মান্তিক বেদনা, নীরবে প্রকাশ করিতে লাগিল। ইন্দুমতী কেবল নরেন্দ্রনাথের বক্ষঃস্থলে মাথা রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল।

নরেন্দ্রনাথ, মহাপুরুষের আদেশানুসারে এই কক্ষে ইন্দুমতীকে পাইয়া হাতে যেন স্বর্গ পাইল।

পরিশিষ্ট।

—*—

শেষ কথা।

যথা সময়ে, নরেন্দ্রনাথ ও ইন্দুমতী বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। ইহাদের আগমন সংবাদে, গ্রামের সমস্ত লোক আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু, নরেন্দ্রের হৃদয়ে আনন্দ জন্মিল না। কারণ, রায়মহাশয় ও গিন্নী, তাহার শোকে, এ সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের শোকেই নরেন্দ্র কিছু দিন পর্য্যন্ত শোকাচ্ছন্ন ছিল। পরে, রীতিমত সংসারসুখে নিমগ্ন হইল। আমরা শুনিয়াছি, নরেন্দ্রের আচরণে ও কার্য্য পরম্পরায় কি গ্রাম্য লোক, কি প্রজা, কি পরিচিত কি অপরিচিত, সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

নরেন্দ্রের জীবনদাতা মহাপুরুষও নরেন্দ্রের বাড়ীতে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ও ইন্দুমতীর বিশেষ আগ্রহে তিনি তাহাদিগকে দিক্ষিত করিয়াছিলেন।

মাধুরীর স্বামী সন্ন্যাসব্রতই অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া, এ সমস্ত কথা জানিয়াছি। সন্ন্যাস গ্রহণ

ল, জন্মভূমি একবার দেখিতে হয়। তন্নিমিত্তই মাধবীর স্বামী
বিদেশে দেশে আসিয়াছিলেন।

গৌরমণিকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়াছি। তারপর, যে তাহার কি
তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয়, তাঁহার দেহ শৃগাল
রের উদরস্থ হইয়া থাকিবে। দোবেঠাকুর গৌরমণির লাঞ্ছনা
খিয়া, ভয়ে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গোপনে প্রস্থান করিয়াছিল।
নরেন্দ্রের বাড়ী আগমনের এক বৎসর পর, রামভদ্র দেশে
প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। দেশে আসিয়া মাত্র অল্প কতকদিন জীবিত
ল।

কিছুদিন পর, তারাকান্ত ও শৈলবালা বাড়ী আসিয়া পৌছিল।
তাহারা ইন্দুমতী ও নরেন্দ্রের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, সহর্ষে তাহাদের
সহিত সাক্ষাৎ করিল। তারাকান্ত যে নরেন্দ্রকে খুঁজিতে গিয়াছিল,
নরেন্দ্র তাহা বাড়ী আসিয়াই জানিতে পারিয়াছিল।

তারাকান্তের সহিত শৈলবালার বিবাহ হয়। এ কার্য্যে নরেন্দ্র
প্রথমেই উদ্যোগী ছিল। কিন্তু, ইন্দুমতীর বিচ্ছেদে সেটি তখন
হইতে পারে নাই। শৈলবালা, বিবাহের পরে মধ্যে মধ্যে
নরেন্দ্রের নিকট আসিয়া, গৃহ পরিত্যাগের পর, ইন্দু যাহা যাহা
করিয়াছিল, তাহা বলিয়া হাসিত—হাসাইত।

সেই সময় ইন্দুমতী নিকটে থাকিলে শৈলবালার আর নিস্তার
থাকিত না। ইন্দু শৈলবালাকে যথোচিত বিরক্ত করিত। নরেন্দ্র সেই
সমস্ত কথা লইয়া, ইন্দুর সহিত রহস্য ও কৌতুক করিত। নরেন্দ্র ও
ইন্দুমতী উভয়েই উভয়ের বিচ্ছেদের পরের ঘটনাবলী একের অন্যের

নিকট বলিয়াছিল' যখন সেই সমস্ত কথা উঠিত, তখন উভয়েই ব্যাকুল প্রাণে কাঁদিত। এইরূপে তাহাদের সুখের জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

আমরাও এখানে গ্রন্থ শেষ করিলাম।

সম্পূর্ণ